ভূত পত্‌রীর দেশ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ভূত পত্‌রীর দেশ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ভূত পত্‌রীর দেশ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আ ন ন্দ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

ISBN 978-81-7066-242-6 (print)
ISBN 978-93-9050-127-4 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: সুব্রত চৌধুরী

সূচিপত্র

ভূতপ্‌তরীর দেশ

‘মাসি পিসি বনগাঁ-বাসী বনের ধারে ঘর
কখনো মাসি বলেন না যে খইমোয়াটা ধর।’

কিন্তু এবারে মাসি পিসি দুজনেই ডেকেছেন। আগে মাসির বাড়ি এসেছি পালকি চড়ে। সেখানে মোয়া খেয়ে পেট ধামা করেছি। এখন পালকিতে শুয়ে পিসির বাড়ি চলেছি। মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন—পথে জল খেতে; হাতে একগাছা ভূতপত্‌রী লাঠি দিয়েছেন—ভূত তাড়াতে; এক লণ্ঠন দিয়েছেন—আলোয়-আলোয় যেত।

হুম্পাহুমা পালকি চলেছে বনগাঁ পেরিয়ে; ধপড়ধাঁই পালকি চলেছে বনের ধার দিয়ে, মাসির ঘর ছাড়িয়ে, ভূতপত্‌রীর মাঠ ভেঙে, পিসির বাড়িতে।

পিসির দেশে কখনো যাইনি। শুনেছি পিসি থাকেন তেপান্তর মাঠের ওপারে সমুদ্দুরের ধারে, বালির ঘরে। শুনেছি পিসি কাঁকড়া খেতে ভালোবাসেন, কচি-কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল রেঁধে লোককে খাওয়াতেও ভালোবাসেন। কিন্তু লোক তো পিসির বাড়ি যায় কত! যে ভূতপত্‌রীর মাঠ! দেখেই ভয় হয়! এই মাঠ ভেঙে দুপুর রাতে পিসির বাড়ি চলেছি। চলেছি তো চলেইছি: ‘হুঁইয়া মারি খপরদারি!’ ‘বড়া ভারি খপরদারি!’

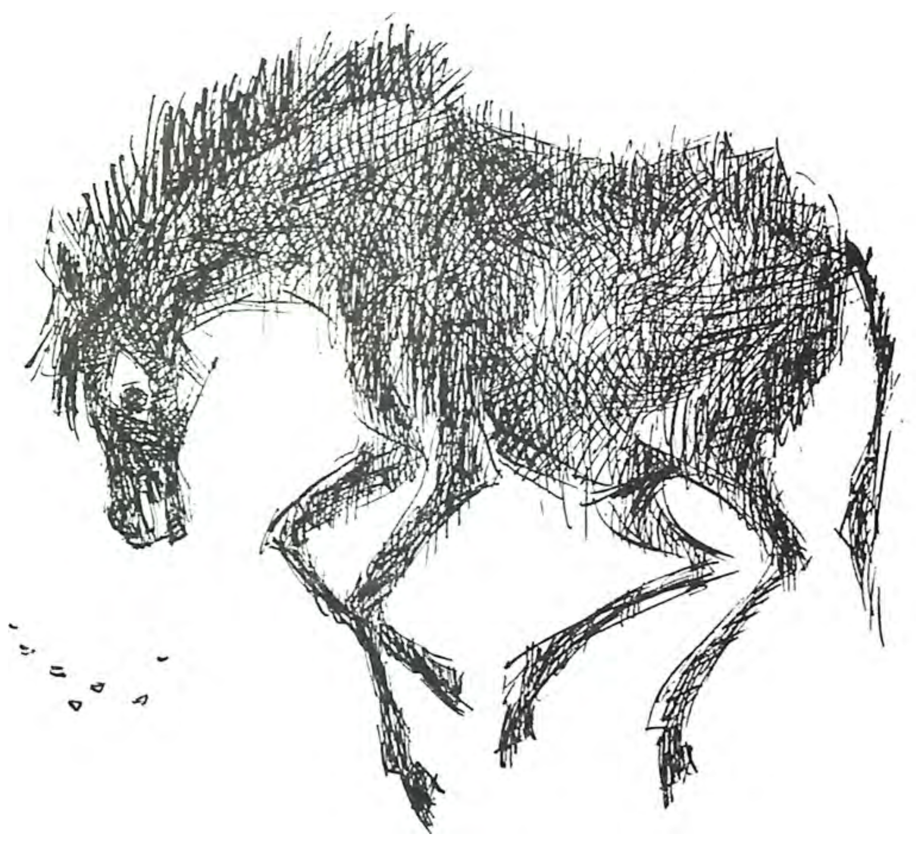
মাঠের মাঝে একটা শেওড়াগাছের ঝোপ, অন্ধকারে কালো বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তারই কাছে ঘোড়ার গোর, তার পরেই তেপান্তর মাঠ! হাটের বাট ওই শেওড়া-তলা পর্যন্ত; তার পরে আর হাটও নেই, বাটও নেই; কেবল মাঠ ধূ-ধূ করছে।

এই শেওড়া-তলায় পালকি এসেছে কি আর যত ঝিঁঝিঁপোকা তারা বলে উঠেছে— ‘চললে বাঁচি!’ ‘চললে বাঁচি! কেন রে বাপু, একটু না হয় বসেছি, তাতে তোমাদের এত গায়ের জ্বালা কেন? ‘চললে বাঁচি!’ চলতে কি আর পারি রে বাপু? অমনি ঝিঁঝিঁপোকা সদার দুই লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নেড়ে বলছে, ‘ওই আসছে চিঁচিঁ ঘোড়া চিঁচিঁ!’ ফিরে দেখি গোরের ভিতর থেকে ঘোড়া-ভূত মুখ বার করে পালকির দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে! ওঠা রে

পালকি, পালা রে পালা! আর পালা! ঘোড়া-ভূত তাড়া করেছে—ঘাড় বেঁকিয়ে, নাক ফুলিয়ে আগুনের মতো দুই চোখ পাকিয়ে!

ভয়ে তখন ভূতপত্‌রীর লাঠির কথা ভুলে গেছি। কেবল ডাকছি—জগবন্ধু, রক্ষে কর, মাসিকে বলে তোমায় খইয়ের মোয়া ভোগ দেব। বলতেই আমার খুঁটে বাঁধা খইগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাসির বাড়ির খই—জুঁইফুলের মতো ফুটন্ত ধবধব করছে খই—রাস্তা যেন আলো করে। ঘোড়া-ভূত কি সে-লোভ সামলাতে পারে? খই খেতে অমনি দাঁড়িয়ে গেছে। বেচারা ঘোড়া-ভূত খই খেতে মুখটি নামিয়েছে কি, অমনি তার ভুতুড়ে নিশ্বাসে খইগুলি উড়ে পালাচ্ছে! যেমন খইয়ের কাছে মুখ নেওয়া অমনি খই উড়ে পালায়। খইও ধরা দেয় না, ঘোড়াও ছাড়তে চায় না। ঘোড়া-ভূত চায় খই খায়, খই কিন্তু উড়ে-উড়ে পালায়।

ঘোড়া চলেছে খইয়ের পিছে, খই উড়েছে বাতাসের আগে, আমি চলেছি পালকিতে বসে ঘোড়া-ভূতের ঘোড়দৌড় দেখতে মুখ বাড়িয়ে। কখন যে মাঠে এসে পড়েছি মনেই নেই। সেখানটায় বড় অন্ধকার, বড় হাওয়া—যেন ঝড় বইছে। মাসির দেওয়া একটি লণ্ঠনের মিটমিটে আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। অন্ধকারে আর ঘোড়াও দেখা যায় না, খইও চেনা যায় না। বেহারাদের বলি—আলো জ্বাল; কিন্তু হাওয়ায় কথা উড়ে যায়; কে শোনে কার কথা! এমন হাওয়া তো দেখিনি! আমার ভূতপত্‌রীর লাঠিটা পর্যন্ত উড়ে পালাবার যোগাড়। লণ্ঠনটি তো গেছে, শেষে লাঠিটাও যাবে? আচ্ছা করে লাঠি ধরে বসে আছি। বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়ছে।



সর্বনাশ! এ যে দেখছি বীর বাতাস! এ বাতাসের মুখে পড়লে তো রক্ষে থাকবে না—পালকি সুদ্ধু ফক, তবে ওই কি, আমার লাঠি, আমার ছাতা, ধুতি-চাদর, পোঁটলা-পুঁটলি, বিছানা-বালিশ কাগজের টুকরোর মতন কোথায় উড়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! পথে জল খেতে দু-মুঠো খই ছিল, তা তো ঘোড়া-ভূতের সঙ্গে কোথায় উড়ে গেছে। শেষে বীর-বাতাসে আমিও উড়ে যাব নাকি? শীতেও কাঁপছি, ভয়েও কাঁপছি। পালকি ধরে বীর-বাতাস এক-একবার ঝাঁকুনি দিচ্ছে, আর হাঁক দিচ্ছি 'সামাল, সামাল!' ভয়ে জগবন্ধুর নাম ভুলে গেছি। পালকিখানা ছাতার মতো বেহারাদের কাঁধ থেকে উড়ে আমাকে সুদ্ধ নিয়ে গড়াতে-গড়াতে চলেছে। পিছনে 'ধর! ধর!' করে পালকি-বেহারাগুলো ছুটে আসছে।

একটা বুড়ো মনসা গাছ, মাথায় তার হলদে চুল, বড়-বড় কাঁটার বঁড়শী ফেলে বালির উপর মাছ ধরছিল। মনসাবুড়োর ছিপে মাছ তো পড়ছিল কত! কেবল রাজ্যের খড়কুটো আর পাখির পালক হাওয়ায় ভেসে এসে বুড়োর বঁড়শীতে আটকা পড়ছিল। এমন সময় আমার চাদরখানা গেল বড়শীতে গেঁথে। আর যার কোথা? পালকিসুদ্ধ বালির উপর উল্টে পড়েছি। বেহারাগুলো একবার আমাকে ছাড়াবার জন্যে পালকির ডাণ্ডা ধরে আমার চাদরটা ধরে টানাটানি করলে, কিন্তু বাতাসের চোটে কোথায় উড়ে গেল আমার সেই উড়ে বেহারা ছ-টা, তাদের আর টিকিও দেখা গেল না!

মনসাবুড়োর হাসি দেখে কে! ভাবলে, মস্ত মাছ পেয়েছি। কিন্তু আমার হাতে ভূতপাত্‌রী লাঠি আছে তা তো বুড়ো জানে না! লাঠি দিয়ে যেমন বুড়োর গায়ে খোঁচা দেওয়া অমনি ভয়ে বুড়োর রক্ত দুধ হয়ে গেছে—সে তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। পালকিটা ঠেলে তুলে, বিছানা-পত্তর পোঁটলা-পুঁটলি যা যেখানে পড়েছিল গুছিয়ে নিয়ে, চুপটি করে বসে আছে—কখন বেহারাগুলো ফিরে আসে। মনসাবুড়োর গা বেয়ে দরদর করে শাদা দুধের মতো রক্ত পড়ছে; সেও কোনো কথা বলছে না, আমিও শাদা রক্ত দেখে অবাক হয়ে চেয়ে আছি।

বুড়ো খুব রেগেছে; তার গায়ের সব রোঁয়াগুলো কাঁটার মতো সোজা হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ গোঁ হয়ে বসে থেকে মনসাবুড়ো আমার দিকে চেয়ে বলছে, 'দেখছ কি? বড় আমোদ হচ্ছে, না? বুড়োমানুষের গায়ে খোঁচা দিয়ে রক্তপাত করে আবার বসে-বসে তামাশা দেখছ, লজ্জা নেই! যাও না, ছাড়া পেয়েছ তো নিজের কাজে যাও না!'

আমি বললুম, 'যেতে পারলে তো! পালকি-বেহারা নেই যে! তারা আসুক তবে যাব।

শুনে বুড়ো হো-হো করে হেসে বললে, ''কেন পা নেই নাকি! হেঁটে যেতে পার না! নবাব হয়েছ?'

আমার ভারি রাগ হল। বুড়োর বঁড়শীর আঁচড়ে দুই পা ছিঁড়ে তখনো আমার ঝরঝর রক্ত পড়ছে। আমি রেগে বললাম, 'পা দুটো কি তার রেখেছ! আঁচড়ের চোটে দফা শেষ করেছ যে!

'লেগেছে নাকি!' বলে বুড়ো খানিক চুপ করে বললে, 'একটু দই দাও, সেরে যাবে।'

আমি বললুম, 'এই মাঠের মধ্যে দই! তামাশা করছ নাকি?'

'আচ্ছা তবে খানিক তেঁতুল-বাটা হলেও চলতে পারে।'

আমার হাসি পেল। নিশ্চয় বুড়োটা ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখছে। 'বলি ও দাদা! এখানে তুমি ছাড়া তো গাছ দেখছি নে, আরেকবার লাঠির খোঁচা দিয়ে তোমার গা থেকে দুধ বার করে নিয়ে দই পাতব নাকি?' বলেই ভূতপত্‌রী লাঠিটা যেমন একটু বাগিয়ে ধরেছি, অমনি বুড়ো বলছে, 'রও রও, কর কি, দাদা! বুড়োমানুষ কখন

কি বলি, রাগ কর না। আমরা মনসাদেবীর বরে চিরকাল নানারকম স্বপন দেখি। এইখানটিতে কতকাল যে বসে আছি তার ঠিক নেই। ছিপ নিয়ে মাছ ধরছিলুম জলের ধারে—আজ সে কত কালের কথা; সে নদী শুকিয়ে জল সরে চড়া পড়ে গেছে, কিন্তু এখনো ঝোঁক কাটেনি; মনে হচ্চে নদীর ধারেই বসে মাছ ধরছি! আমার বেশ মনে পড়ছে এইখানেই একঘর গয়লা থাকত আর ঠিক তাদের ঘরের কোণে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ ছিল, এখন তবে সেগুলো গেছে?' বলেই বুড়ো ঝিমিয়ে পড়ে দেখে আমি তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা দাদা, ওই যে ঘোড়া-ভূত আর ঝিঁঝিঁপোকা দেখে এলুম, ওদের কথা তুমি কিছু জানো কি?'

'জানি বইকি! ওরা তো সেদিনের ছেলে!' বলেই বুড়ো গল্প শুরু করলে :

'দেখ, এই পৃথিবী তখন সবে তৈরি হয়েছে, আমাদের মতো দু-চারটি গাছ ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই; —নদী নেই, পাহাড় নেই, এমন কি বাতাসে শব্দটি পর্যন্ত নেই; —কেবল বালি ধূধূ করছে—ঠিক এই জায়গাটির মতো। আমার তখন সবেমাত্র কচি-কচি দুটি কাঁটা বেরিয়েছে—ছোট ছেলের কচি-কচি দুটি দাঁতের মতো। সেই সময় তারা গান বড় ভালোবাসে, তারা দেখতে অনেকটা মানুষের মতো, কিন্তু ফড়িংগুলোর মতো তাদের ডানা আছে, পাখিগুলোর মতো পা, ঝাঁক বেঁধে তারা আমাদের কাছে উড়ে এসে বসল আর গান গাইতে আরম্ভ করলে। আকাশ-বাতাস তাদের গানের সুরে যেন বেজে উঠল। সে যে কি চমৎকার তা তোমাকে আর কি বলব! আমরা তার আগে শব্দ শুনিনি, গানও শুনিনি—আনন্দে যেন শিউরে উঠলুম। বালি ঠেলে যত গাছ, যত ঘাস মাথা তুলে কান পেতে সেই গান শুনতে বেরিয়ে এল, পৃথিবীর ভিতর থেকে পাহাড়গুলো গা- ঝাড়া দিয়ে উঠে এল, পাহাড়ের ভিতর থেকে নদীগুলো ছুটে-ছুটে বেরিয়ে এল। গান শুনতে-শুনতে দেখতে-দেখতে আমরা বড় হয়ে উঠলুম। কিন্তু যারা গান গাইতে এল, কি খেয়ে তারা বাঁচে? পৃথিবীতে তো তখন ফুলও ছিল না, ফলও ছিল না; ছিল কেবল আমাদের মতো বড়-বড় গাছ; কাঁটা লতা আর পাতা। নদীতে মাছও ছিল না, আকাশে পাখিও ছিল না যে তারা ধরে খায়। তবু তারা অনেকদিন বেঁচে ছিল কেবল গান গেয়ে। একদিন হঠাৎ শুনি যে গান বন্ধ হয়ে গেছে—তারা সবাই মরে গেছে—শুকনো পাতার মতো তাদের সোনার ডানা বাতাসে উড়ে এসে আমাদের গায়ে বিঁধতে লাগল, কিন্তু তাদের গানের সুর আর শোনা গেল না। তারপর পৃথিবীতে অনেকদিন আর কোনো সাড়াশব্দ নেই; কেবল দেখছি, একদল কারা জানি না, দেখতে অনেকটা মানুষ আর ঘোড়ার মতো, এদিকে-ওদিকে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরই খুঁজে-খুঁজে যারা গান গাইতে এসেছিল। ক্রমে দেখি তারাও মরে গেছে। পৃথিবীতে আর তখন কিছু চলে বেড়াচ্ছে না, গান গাইছে না—কেবল গাছের দল আমরা চুপ করে বসে আছি। আমাদের বয়েস ক্রমে বাড়ছে আর আমরা বুড়ো হচ্ছি। তখন জলে মাছ দু-একটি দেখা দিয়েছে; আমি কাঁটা আর বঁড়শী ফেলে এক রাত্তিরে মাছ ধরছি এমন সময়—'



বলেই মনসাবুড়ো ঝিমিয়ে পড়ল! আমি যত বলি, ‘এমন সময় কি হল দাদা? আবার বুঝি সেই ফড়িংদের মতো মানুষগুলো ঝিঁঝিঁপোকা হয়ে ফিরে এসে গান গাইছে দেখলে? দেখলে বুঝি সেই মানুষের মতো ঘোড়াগুলো ভূত হয়ে অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে তাদের গান শুনতে এল?’ বুড়োর আর কথা নেই; কেবল একবার হুঁ বলেই চুপ করলে।



আমি ভাবছি দিই আর-এক ঘা লাঠি বুড়োর মাথায় বসিয়ে, এমন সময় দেখি দূর থেকে একটা আলো আসছে—যেন কে লণ্ঠন-হাতে আমার দিকে চলে আসছে। একবার ভাবছি বুঝি বেহারা কজন আলো নিয়ে আমাকে নিতে এল। একবার ভাবছি, কি জানি মাঠের মাঝে আলেয়া দেখা দেয়, তাও তো হতে পারে। কিন্তু দেখলুম আলোটা এসে পালকির খানিক দূরে থামল; আর চারটে জোয়ান উড়ে আমার পালকিটা কাঁধে নিলে। উড়েদের একেই একটু ভুতুড়ে চেহারা, কাজেই ঠিক আন্দাজ করতে পারলুম না যে তারা ভূত না মানুষ। একবার তাদের পায়ে দিকে চেয়ে দেখলুম, ভূতের মতো তাদের পায়ের গোড়ালি উল্টো কিনা। কিন্তু অন্ধকারে কিছু ঠিক করতে পারা গেল না। মনসাবুড়োকে ডেকে বললুম, 'দাদা, তবে যাচ্ছি।'

দাদা আমার তখন ঝিমোচ্ছন; চমকে উঠে বললেন, 'যাবে নাকি? গল্পটা তো শেষ হল না?'

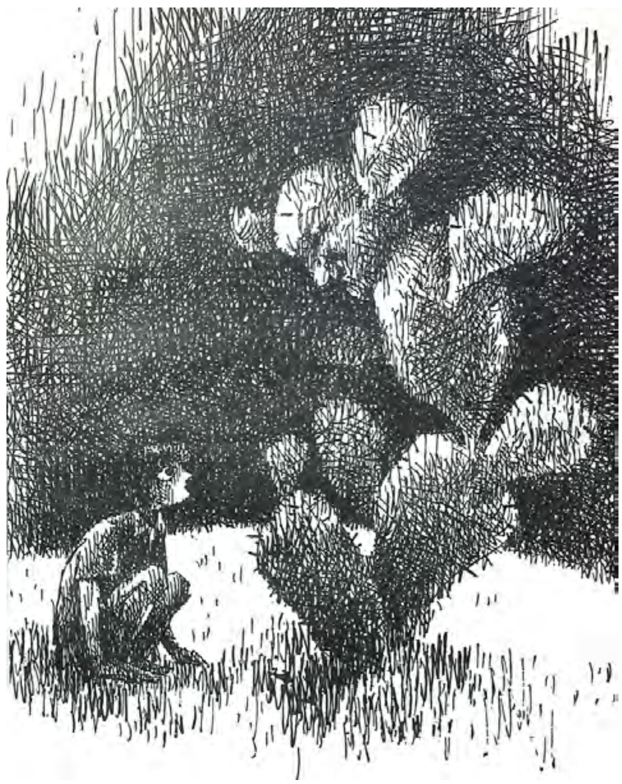
পালকি তখন চলেছে, মুখ বাড়িয়ে বললুম, 'দাদা, একরকম গল্পটা শেষই করেছিলে, কেবল তোমার মাথার চুল হলদে আর তোমার রক্ত শাদা কেন, সেইটে বলতে বাকি রয়ে গেল।'

'মাস্টারমশায়ের কাছে জেনে নিও—' বলেই দাদা আবার ঝিমিয়ে পড়লেন। হু-হু করে পালকি আমার মাঠের দিকে বেরিয়ে গেল।

একটু ভয়-ভয় করছে; বেহারাগুলো মানুষ না ভূত বুঝতে পাচ্ছিনে। পালকির দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল—মানুষ-উড়ে পালকি-কাঁধে হুম্মাহুমা ডাক ছাড়ে, এরা তো হাঁক দিচ্ছে না। পড়েছি ভূতের হাতেই! পড়েছি, আর কোনো ভুল নেই। আচ্ছা দেখা যাক, ভূতপত্‌রী লাঠি তো আছে। তেমন-তেমন দেখি তো দুহাতে লাঠি চালাব।

ভূতপত্‌রী লাঠির কথা মনে করেছি কি অমনি ধপাস করে পালকিটা তারা মাটিতে ফেলেছে, কোমরটা আমার খচ করে উঠেছে। 'তবে রে ভূত-উড়ে, আমাকে এই মাঠে একলা নামিয়ে দিয়ে পালাবে ভেবেছ! তোল্

পালকি, ওঠা সোয়ারী' —বলেই লাঠি নিয়ে যেমন তেড়ে যাব, কোমরটা আমার বেঁকে পড়ল। ভূতগুলো দেখেই খিলখিল করে হেসে অন্ধকারে মাঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। মহা বিপদ! এই রাত্তিরে মাঠের মাঝে ভূতের ভয়, বাঘের ভয়, সাপের ভয়, তার ওপর কোমর ভেঙে গেল! লাঠি ধরে যে গুড়গুড়ি পালাব তারও জো নেই। মনসা-কাঁটায় পা ছিঁড়ে গেছে। 'দূর কর আর ভাবতে পারিনে, যা হয় হবে!' বলে পালকির ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। খিদেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে।



একলা থাকতে-থাকতে ক্রমে ঘুম এসেছে। একটু চোখ বুজেছি কি না অমনি খস করে একটা শব্দ হল। চোখ চেয়ে দেখি, বালির ওপরে গোটাকতক তালগাছ উঠেছে, তাদের মাথা যেন আকাশে ঠেকেছে, আর একটা আলো ঘুরে-ঘুরে সেই তালগাছে ঠেকেছে, আবার সড়সড় করে নেমে আসছে! আমি আর না-রাম না-গঙ্গা! কাঠ হয়ে পড়ে আছি কেবল দুটি চোখ চাদরের একটি কোণ দিয়ে বের করে।

দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে-আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রকাণ্ড একটা কাঁচের গোলা মাঠের ওপর দিয়ে বোঁ-বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল! তালগাছের তলায় সে আলোটা টিপ-টিপ করছিল সেটা জোনাকি-পোকার মতো উড়ে গিয়ে সেই গোলটার ওপর বসল। বসেই গোলাটাকে আমার দিকে গড়িয়ে আনতে লাগল!

গেছি, পালকিসুদ্ধ গোলাটার ভেতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভেতরে মাছের মতো আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি—বন্‌বন্‌ করে লাঠিমের মতো ঘুরতে-ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ

ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভেতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে! কখনো মাঠের ওপর দিকে কখনো গাছের মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা শাদা খরগোশের মতো লাফিয়ে, গড়িয়ে, কখনো জোরে, কখনো আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলেছে!

ভয়ে দুই হাতে চোখ ঢেকে চলেছি। ক্যাঁ-কোঁ চরকা-কাটার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি এক বুড়ি সুতো কাটছে আর একটা খরগোশ তার চরকা ঘুরোচ্চে। বুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, যে চাঁদের ভেতরে বসে থাকে! আর ওই তার চরকা, ওই খরগোশ! আঃ বাঁচা গেল, এটা তবে গোলাভূত নয়! ইনিই আমাদের চাঁদমামা আর বুড়ি তো আমাদের মামি! আর এ খরগোশ তো আমাদের সেই খাঁচার খরগোশটি, বিলিতি ইঁদুরের আর গিনিপিগগুলির বড়মামা!

‘বলি মামি, এমন করে কি ভয় দেখাতে হয়!’ বলেই আমি খরগোশটাকে খপ করে কোলে তুলে নিয়েছি।

‘ওরে ছাড়, ছাড়! আমার চরকা কাটা বন্ধ করিস নে, দেখচিস নে এই চরকার জোরেই চাঁদমামার সংসার চলছে!’

সত্যিই দেখি চরকা বন্ধ হতেই চাঁদমামা গড়াতে-গড়াতে থেমে গিয়ে লাঠিমের মতো মাটির ওপর কাত হয়ে পড়েছেন! আমি খরগোশটি মামির হাতে দিয়ে বললুম, ‘কই মামি, চালাও দেখি মামাকে।’

খরগোশ চরকায় যেমন এক পাক দিয়েছে অমনি চাঁদমামা গা-ঝাড়া দিয়ে ঘুরতে লেগেছেন। বুড়ি ডাকছে, ‘দে পাক, দে পাক! খরগোশ ততই পাক দিচ্ছে আর চাঁদমামাও তত ঘুরপাক দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে রবারের বলের মতো নাচতে-নাচতে চলেছেন। যত বলি, ‘মামি আর পাক দিও না, মামাকে আমার অত ঘুরিও না, মামা হাঁপিয়ে দম আটকে কোনদিন মারা পড়বেন যে! একটু রয়ে-বসে চালাও, শেষে বুড়ো বয়েসে মামার কি মাথা ঘুরুনির রোগ ধরিয়ে দেবে?’ জানি কি যে মামি আমার কালা! আমার একটি কথাও বুড়ির কানে যায়নি। সে কেবল বলছে, ‘দে পাক, দে পাক!’ আমি যত ইশারা করে বলি, ‘আস্তে, আস্তে!’— বুড়ি ভাবে জোরে চালাতে বলছি, ততই ডাকে, ‘দে পাক, দে পাক!’



মামা রেলের গাড়ির মতো হু-হু করে ছুটে চলেছেন। 'ওরে মাথা! মাথা ঘুরে গেল, আর যে পারিনে'—বলেই লাঠি তুলেছি খরগোশটাকে মারতে। যেমন লাঠি তোলা অমনি খরগোশটা খ্যাঁক করে তেড়ে এসেছে, ক্যাঁচ করে চরকাটা বন্ধ হয়ে গেছে আর পটাং করে মামির হাতের সুতো কেটে গেছে। যেমন সুতো কাটা আর ঝপাং করে চাঁদামামা গিয়ে একটা নদীর জলে পড়েছেন, পড়েই ফেটে চৌচির!

'কি করলে গো মামি!' বলেই চমকে দেখি নদীর ওপারে পালকিসুদ্ধ আমি ঠিকরে পড়েছি! কোথায় বুড়ি, কোথায় চরকা, কোথায় বা সে খরগোশ! নদীর জলে দেখি একরাশ কাঁচের টুকরোর মতো চাঁদামামার ভাঙা আলো, খানিক চকচক করেই নিভে গেল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই চাঁদামামার আধখানা কোথায় উড়ে গেছে।

ভাগ্যি নদীতে তেমন জল ছিল না, নইলে সবাই আজ ডুবেছিলাম আরকি! বড় তেষ্টা পেয়েছিল! নদী থেকে এক ঘটি জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তবে বাঁচি!

নদীর ধারেই একটা গাঁ রয়েছে। দেখে সাহস হল; ভাবলুম—আজ রাত্তিরে ওই গাঁয়ে কারু গোয়াল-ঘরে শুয়ে থাকি; কাল সকালে এখান থেকেই ফিরে পালাব, পিসির বাড়ি যাওয়ার আর কাজ নেই বাবা! এই মনে করে গাঁয়ের ভেতরে গিয়ে দেখি, সেখানে জনমানব নেই। ডাক-হাঁক করে কারো সাড়াও পাইনে! যাই হোক, গাঁ ছেড়ে আর এক পা-ও নড়া নয়। চাদর মুড়ি দিয়ে একটা ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়লুম। যেমন শোয়া, আর ঘুম—অকাতরে ঘুম।

খানিক পরে জেগে দেখি, সেই মনসাতলার লণ্ঠন-ভূতটা আর তার চার বন্ধু আলো নিয়ে আমার মুখের কাছে বসে আছে। ‘তবে রে!’ বলেই যেমন উঠতে যাব অমনি তারা বলে উঠেছে, ‘দেখ বাবু, ফের যদি লাঠি দেখাও কি মারতে আস, তবে আবার আমরা তোমাকে ফেলে পালাব। আর যদি চুপ করে ভালোমানুষটি হয়ে পালকিতে বসে থাক, তবে ওই কি-বলে ও-কি-তলা পর্যন্ত তোমাকে আমরা পৌঁছে দেব।’ বুঝলুম, ভূতগুলো ভয়ে রামনাম মুখে আনতে পারছে না, তাই পিসির বাড়ি যেতে যে রামচণ্ডীতলার কথা শুনেছি তাকে বলছে—কি-বলে-ও-কি-তলা।



ভূতগুলো ভয় পেয়েছে দেখে সাহস হল; পালকিতে আবার উঠে বসলুম।

এবারে আর ভয় করছে না—ভোর হবার এখনো দেরি আছে কিন্তু এরই মধ্যে ভূতগুলো যেন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে; মাঠে আর ঘন-ঘন আলেয়া দেখা দিচ্ছে না, পথের ধারে তালগাছ তো দেখাই দিচ্ছে না, কোথাও মনসাগাছের ছায়াটি পর্যন্ত আর দেখা যায় না। পুবদিক থেকে ভোরের বাতাস একটু-একটু আসছে; ভূতগুলো হাওয়া পেয়েই যেন জড়োসড়ো। আমি কিন্তু বেশ আরামে পালকিতে দরজা খুলে ঘুম দিতে-দিতে চলেছি।

ভোর হয় দেখে ভূত-বেহারা চারটে ভয় পেয়েছে, কিন্তু রামচণ্ডীতলায় আমাকে পৌঁছে দিলেই তাদের ছুটি এই ভেবে তাদের একটু আহ্লাদও হয়েছে। চার ভূত চার সুরে চিঁচিঁ, পিঁপিঁ, খিটখিট, টিকটিক করে গান গাইতে-গাইতে চলেছে—ঠিক যেন কত দূর থেকে চিল ডাকছে, আর কোলাব্যাঙ কটকট করছে। ঘুমের ঘোরে শুনছি যেন ‘কুহু কেকা’র ঠিক সেই পালকির গানটা! কিন্তু কথাগুলো সব উল্টোপাল্টা আর সুরটাও বেখাপ্পা বেয়াড়া

—বেজায় ভুতুড়ে। কেবল হাড় খটখট, দাঁত কিটমিট, গোঙানি আর কাতরানি শুনে যে গায়ে জ্বর এল! ঘুমিয়ে আছি কিন্তু তবু শুনছি :

চলে চলে
    হুমকিতালে
        পংখী গালে
            মাসিপিসি
                বাঘবেরালে।

ভূতপেরেতে
    চলেছে রেতে
        হনহনিয়ে
            ভূতপেরেতে।

পালকি দোলে
    উঠতি আলে
        নালকি দোলে
            নামতি খালে।

আলো-আঁধারে
    শেওড়াগাছ
        কালোয় শাদায়
            বেরাল নাচ।

মরানদী
        বালির ঘাট
        মনসাতলায়
        মাছের হাট।

ভূতের জমি
ভূতের জমি
ভূতপেরেতের
নাইকো কমি।

উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে
চলছে কতক
হনহনিয়ে

চলছে কতক
গাছতলাতে
দুলছে কতক
তালপাতাতে।

দিনদুপুরে
বাদুড় ঘুমোয়
রাতদুপুরে
হুতুম থুমোয়।

ভোঁদড় ভাম
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি
টিকটিকি আর
কানামাচি।

গঙ্গাফড়িং
জোনাকপোকা
আরসোল্লা
ন্যাংটা খোকা।

ছুঁচো ইঁদুর
খ্যাঁকশেয়াল

শুকনো পাতা
গাছের ডাল।

সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
ঘূর্ণি-হাওয়ায়
চলছে ঘুরে

জগৎ জুড়ে
ঘুরছে ধুলো
বাতাস দিয়ে
দুলছে কুলো!

সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
আলো-আলেয়া
জ্বলছে দূরে

সব ভুতুড়ে
ভূতের খেলা
খেজুরতলায়
ইঁটের ঢেলা···

গানটা শুনেছি একবার— 'ছুঁচো, ইঁদুর, কানামাছি, ভোঁদড়, প্যাঁচা, টিকটিকি, খ্যাঁকশেয়াল।' গানটা শুনছি দু'বার— 'গঙ্গাফড়িং, জোনাকপোকা, আরসোলা, বাদুড়!' গানটা শুনছি তিনবার—'আলো-আলেয়া, ঘূর্ণি-হাওয়া, খেজুরগাছ, ইঁটের ঢেলা।' একবার, দু-বার, তিনবার, বারবার তিনবার ইঁটের ঢেলা পড়েছে কি আর পালকিসুদ্ধ আমাকে ভূতগুলো ঝপাং করে মাটিতে ফেলে খেজুরগাছের তলায় একটা মরা গরু পড়েছিল সেটাকে নিয়ে লুফতে-লুফতে দৌড় মেরেছে! ওদিকে অমনি রামচণ্ডী থেকে রাত তিনটের আরতি বেজেছে— টংটং, টং-আ-টং, টংটং-আ-টং।

এই খেজুরতলা পর্যন্ত ভূত আসতে পারে, তার ওদিকে রামচণ্ডীতলা, যেখানে রাম-সীতা বসে বসে আছেন, হনুমান, জাম্ববান পাহারা দিচ্ছে, ভূতের আর সেখানে এগোবার জো নেই। ভূতপতরীর লাঠিরও জোর সেখানে খাটবে না। কাজেই পোঁটলা-পুঁটলি, লাঠি-ছাতা সমস্ত পালকিতে রেখে, কোমর ধরে, খোঁড়াতে-

খোঁড়াতে বালি ভেঙে রামচণ্ডীতলায় রামসীতা দেখতে তিনটে রাতে অন্ধকার দিয়ে একলা চলেছি। সঙ্গে একটি আলো নেই, হাতে লাঠিটি পর্যন্ত নেবার জো নেই। কি জানি লাঠি দেখে যদি হনুমান মন্দিরে ঢুকতে না দেয়! তখন যাই কোথা?

'রাম-রাম' বলতে-বলতে বালি ভেঙে চলেছি। বালি তো বালি একেবারে বালির পাহাড়! এক-একবার পিছন ফিরে দেখছি ভূতগুলো আসছে কিনা। যদিও এখানকার বালিতে পা দিলেই তাদের মাথার খুলি ফটাস করে ফেটে যাবে তবুও খেজুরগাছটার ওপর থেকে তারা ভয় দেখাতে ছাড়ে না; টুপ করে হয়তো একটা খেজুর-আঁটি এসে গায়ে পড়ল, হয়তো দেখছি খেজুরতলায় যেন একটা কচি ছেলে ওমা-ওমা করে কাঁদছে, শুনে ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে দেখি—বুঝি কাদের ছেলে পথ হারিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে; হয়তো আমার নাম ধরেই পেছন থেকে কে একবার ডাকলে, গলাটা যেন চেনা-চেনা, ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই! অন্ধকারে হয়তো দেখলুম মাঠের মাঝে একটা জায়গায় খানিকটা জ্বলন্ত বালি তুবড়ি-বাজির মতো ফস করে জ্বলে উঠল, ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখি কিন্তু গেলেই বিপদ—একেবারে ভূতে ধরে জরিমানা করে তবে ছাড়বে, নয়তো মট করে ঘাড় মটকে দেবে।

আমি আর এদিক-ওদিকে কোনোদিক না দেখে 'সীতারাম-সীতারাম' বলতে-বলতে চলেছি। ওই দেখা যাচ্ছে বালির পাহাড়ের ওপরে পঞ্চবটীর বন, বনের মাথায় রামসীতা মন্দিরের চুড়ো। মনে হচ্ছে এই কাছেই, আর একটু গেলেই পৌঁছে যাব, কিন্তু যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন সব দূরে সরে যাচ্ছে—আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমিও দৌড়েছি খোঁড়া পা নিয়ে, দৌড়েছি হাঁপাতে-হাঁপাতে, দৌড়েছি উঠি-তো-পড়ি বালির ওপর দিয়ে।

এইবার শুনতে পাচ্ছি মন্দিরের খোল-করতাল বাজছে; দেখতে পাচ্ছি জাম্ববানের দল আগুন জ্বালিয়ে গাছতলায় বসে আছে; হনুমানের ল্যাজ বটের ঝুরির মতো পাতার ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে। আর ভয় কি! বলে যেমন রামচণ্ডীতলায় ছুটে যাব আর নাকটা গেল ঠুকে। একি, নাক ঠুকল কিসে? এই তো সামনে সোজা রাস্তা—গাছের তলা দিয়ে মন্দিরে উঠেছে; তবে নাক ঠোকে কিসে?

নাকে হাত দিয়ে দেখি নাকটা বিলিতি-বেগুনের মতো ফুলে উঠেছে। সামনে হাতড়ে দেখি প্রকাণ্ড কাঁচ, তার ভেতর থেকে ফ্রেমে-বাঁধা ছবির মতো রামচণ্ডীর মন্দির, পঞ্চবটী বন, হনুমানের ল্যাজ, সবই দেখা যাচ্ছে; কেবল তার ভেতরে যাওয়া যাচ্ছে না। ফড়িংগুলো যেমন লণ্ঠনের চারদিকে মাথা ঠুকে মরে, আমিও তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে কেবল নাক ঠুকে-ঠুকে। নাকটা বেগুনের মতো গোল হয়ে ফুলে উঠেছিল, কাঁচে লেগে-লেগে ক্রমে চ্যাপটা হয়ে গেল, তবু ভেতরে ঢোকার রাস্তা কিন্তু পেলুম না।

হাঁপিয়ে গেছি, বালির ওপরে বসে পড়েছি, হনুমানের গোটাকতক ছানা আমাকে দেখে দাঁত বের করে হাসছে। ভারি রাগ হল, রাগে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। 'জয় রাম!' বলে দিয়েছি এক লাফ সেই কাঁচের ওপরে।

লাফ দিয়েই ভাবলুম—গেছি! হাত-পা কেটে, সকল গায়ে কাঁচ ফুটে রক্তারক্তি হল দেখছি! কিন্তু আশ্চর্য! রামনামের গুণে জলের মতো কাঁচ কেটে একেবারে ভেতরে গিয়ে পড়েছি—হনুমানের জাম্ববানের দলের মাঝখানে! আর অমনি চারদিকে রব উঠেছে—'জয় রাম! জয়-জয় রাম, সীতারাম!' সমুদ্দুরের ডাক শুনছি—'জয়-জয় রাম!' বাতাসে শব্দ শুনেছি—'জয় রাম!' চারদিকে 'জয় রাম সীতারাম!'

কেউ আমাকে একটি কথাও বললে না, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না! আমি রামসীতা দর্শন করে একটা কাঁটাবন পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছি। সেখানে দেখি, ছটা বেহারা আমার পালকিটি নিয়ে বসে আছে—দেখতে কালো কিচ্‌কিন্দে।

'কে হে বাপু তোমরা আমার পালকিটি নিয়ে?'

'বাবুজি, আমরা তোমার পিসির চাকর—কিচ্‌কিন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে, হারুন্দে।'

'আচ্ছা বাপু, চল তো পিসির বাড়ি'—বলেই আমি পালকি চেপে বসেছি।

এবার চলেছি আরামে, কোনো ভয় নেই; পা ছড়িয়ে বসে, পালকির দুই দরজা খুলে, মনের আনন্দে চারদিক দেখতে-দেখতে চলেছি। কেমন তালে-তালে এবার পালকি চলেছে—কালকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি! ঝাঁকুনি নেই, পালকি চলেছে—আমকাসুন্দি, জামকাসুন্দি! যেন জলের ওপর দুলতে-দুলতে নেচে চলেছে। পিসির পালকি চলেছে—ধর কাসুন্দে, চল বাসুন্দে, বড়া ঝালুন্দে, খোঁড়া মালুন্দে। পালকির এক দরজা ধরে চলেছে হারুন্দে, আর এক দরজা ধরে চলেছে উড়েদের সর্দার—কালো কিচকিন্দে।

হারুন্দের মাথায় কালো চুলের উঁচু ঝুঁটি আর কিচ্‌কিন্দের মাথায় পাকা চুলের শণের নুটি। হারুন্দে ফরসা, কিচকিন্দে কালো মিশ—যেন বাংলা কালি! হারুন্দের চুল যেন বালির ওপরে মনসাগাছ—খাড়া-খাড়া, খোঁচা-খোঁচা, আর কিচকিন্দের চুল যেন সমুদ্দুরের শাদা ঢেউ—হাওয়ায় লটপট করছে। কিচকিন্দের মাঠটাও দেখছি খানিক শাদা, খানিক কালো, খানিক আলো খানিক অন্ধকার—একদিকে ধপধপ করছে শুকনো বালি আর-দিকে টলমল করছে কালো জল—নুনে গোলা। মাঠ দিয়ে চলছি, না, শাদা-কালো মস্ত একখানা সতরঞ্চির ওপর দিয়েই চলেছি!

আমার বাঁদিকে কেবল বালি—শাদা ধপধপ করছে বালি; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর—কালো—কাজলের মতো কালো, বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে—ডাঙার খবর দিতে-দিতে, ডাইনে চলেছে কিচকিন্দে—জলের আদি-অন্ত কইতে-কইতে। আমি চলেছি পালকিতে শুয়ে মনে-মনে দুজনের দুটো গল্প শাদা একটা শেলেটের ওপর কালো পেনসিল দিয়ে লিখে নিতে-নিতে। কিচকিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে-নিতেই ধুয়ে-মুছে গেছে, একটুও আর পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের মতো একেবারে শেলেটে কেটে বসে গেছে—ধুলেও যায় না, মুছলেও যায় না—বেশ পষ্ট-পষ্ট পড়া যাচ্ছে।



হারুনদের কথা

'আমার নাম হারুন্দে নয়—হারুন-অল-রসিদ, বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা। এখন হয়েছি হারুন্দা।'

বোগদাদের হারুন-অল-রসিদের কথা আরব্য উপন্যাসে পড়েছি, আবু হোসেনের থিয়েটারেও তাকে দেখেছি—কখনো সদাগর সেজে বেড়াচ্ছে, কখনো ফকির, কখনো বা কাফ্রি চাকর। এখন আবার তিনি উড়ে-বেহারা সেজে এলেন দেখছি!

অবাক হয়ে হারুন্দের মুখের দিকে চেয়ে আছি—কখন আবার সে ফকির হয়, কি বাদশা হয়! আমাকে হাঁ করে থাকতে দেখে বলছে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না বুঝি? আচ্ছা দেখ!' বলেই একবার হারুন্দে দাড়িতে গোঁফে মোচড় দিয়েছে। আর অমনি দেখি, সে হারুন্দে আর নেই! ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ, মাথায় বকের পালক-গোঁজা পাগড়ি, গায়ে চিনেপোতের জোব্বা-কাব্বা পায়ে ঢিলে ইজের আর দিল্লির লপেটা পরে হাতে বাঁকা এক তলোয়ার নিয়ে দেখা দিয়েছে—হারুন বাদশা! ফিক করে হেসে আমাকে সে যেমন সেলাম করেছে আর অমনি আমি ফস করে দেশলাই জ্বেলে ফেলেছি। বাদশার হাতে গলায় মাথায় হীরে-মানিকের গহনাগুলো এমন ঝকঝক করে উঠেছে যে চোখে ধাঁধা লেগে গেছে। কিচকিন্দে ছিল পাশে; সে অমনি ফুঃ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। আর কোথায় বাদশা? —যে হারুন্দে সেই হারুন্দে!

আলো জ্বালতে হারুন্দে ভারি রেগে গেছে, কিছুতে আর গল্প বলতে চায় না। অনেক হাতে-পায়ে ধরে তাকে ঠাণ্ডা করেছি তবে সে আবার গল্প বলছে, 'দেখলে তো আমিই ছিলুম বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা হারুন-অল-রসিদ! আর ওই যে কালো কিচকিন্দে উড়েটা তোমার ওপাশে চলেছে, ও ছিল মসুর—আমার কাফ্রি চাকর। তুমি ফস করে যেমন আলো জ্বেলেছিলে ও তেমনি খপ করে তোমার মাথা কেটে ফেলতে পারে যদি আমি হুকুম দিই। দেখবে? মসুর—'

'না! না!' বলেই আমি হারুন্দের মুখ চেপে ধরেছি, পাছে হুকুম বেরিয়ে পড়ে। কিচকিন্দে আমার গা টিপে বলছে, 'শোনো কেন? ওটা একটা পাগল, আমি কোনো-পুরুষে ওর চাকর নই।'

একটা ভারি মজা দেখছি—কিচকিন্দে আমার গা-টি ছুঁয়েছে আর তার মনের কথা পষ্ট-পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, কিচকিন্দেকে মুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে হচ্ছে না।

কিচকিন্দের কথায় সাহস পেয়ে হারুন্দের মুখ ছেড়ে দিলুম। ছাড়তেই শুনলুম, হারুন্দের মুখের হুকুমটা গোঁ করে তার বুকের ভেতর নেমে গেল; হারুন্দেও আর রাগ-টাগ করলে না।

'দেখলে তো!' বলেই সে আবার গল্প শুরু করল: 'একদিন আমি আমার বসরাই-গোলাপবাগ বলে যে বাগান সেখানে বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছি, আর গোলাপ-জলের ফোয়ারার ধারে বসে ওই মসুর আমার পোষা বুলবুল বোস্তাঁর সোনার খাঁচাটা ধুয়ে-মেজে সাফ করছে, এমন সময় সিন্ধবাদ নাকি সাত সমুদ্দুরের জলে সাতখানা জাহাজ-ডুবি করে এসে হাজির—ভিজে কাপড়ে দু-হাতে আমাকে সেলাম ঠুকতে-ঠুকতে। মসুরকে বলেছি আনতে একখানা চৌকি, না, মসুরটা এমন গাধা যে এনেছে একটা টুল। আমি রেগে মসুরের মাথা কাটতে যাব আর অমনি সিন্ধবাদ আমার দু-পা জড়িয়ে ধরে বলছে, হুজুর মসুরকে মাপ করুন—অনেকদিনের পুরোনো চাকর। শুনুন, এবার কি আশ্চর্য কাণ্ড দেখে এসেছি। এবারে আমি জাহাজ নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলুম, কাঁচের বাসনের বদলে অনেক হীরে-জহরত হিন্দুস্থানের বোকা লোকগুলোর কাছ থেকে ঠকিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে আসছি, এমন সময় জাহাজ আমাদের ঝড়ে পড়ল। এমন ঝড়ও কখনো দেখিনি, সমুদ্দুরে এমন ঢেউও কখনো পাইনি! পাল, দড়ি, হাল, দাঁড় ভেঙেচুরে ছিঁড়ে-খুঁড়ে কোথায় উড়ে গেল তার ঠিক নেই! সাতদিন সাতরাত আমাদের জাহাজ মোচার খোলার মতো জলে ভাসতে-ভাসতে শেষে এসে কালাপানিতে পড়ল; সেখানে সমুদ্দুরের জল, হুজুর, ওই মসুরের মতো কালো, আর যেন রেগে টগবগ করে ফুটছে! যেমন কালাপানিতে জাহাজ পড়েছে আর মাঝিমাল্লা সবাই আল্লা-আল্লা করে কেঁদে উঠেছে। যত বলি—কাঁদিস কেন? কি হয়েছে। বল? —কেউ আর কথার উত্তরেই দেয় না, কেবল ডাঙার দিকে একটা কাফেরদের মন্দির দেখায় আর ভেউ-ভেউ করে কাঁদে। এমন সময় জাহাজের কাপ্তেন আমার কাছে এসে বললে—কর্তা আর দ্যাহেন্‌ কি? আল্লার নাম ল্যান! ওই যে কাফেরদের মন্দির, ওর মাথায় একটা জাঁতার মতো চুম্বক-পাথর আছে, তারি টানে জাহাজের যত লোহার পেরেক সব একটি-একটি করে খুলে ওই মন্দিরের গায়ে যেয়ে লাগবে আর জাহাজের কাঠগুলি ভুস করে আলগা হয়ে মাঝিমাল্লা মালমাত্তা সব জলে যাবে! কত্তা সব জলে যাবে! বলতে-বলতে দেখি, জাহাজ থেকে পেরেকগুলো খুলে-খুলে বিষ্টির মতো গিয়ে সেই মন্দিরের চুড়োয় চুম্বক পাথরটায় লাগছে। দেখতে-দেখতে আমাদের মুরগি রাঁধবার লোহার হাঁড়ি আর রুটি সেঁকবার তাওয়াখানা গেল উড়ে। আমার হাতে আমার হীরে-জহরতের লোহার সিন্দুকের চাবিটা ছিল, সেটাও দেখি পালাই-পালাই কচ্ছে। আমি—না আল্লা, না খোদা—চাবিটাকে মুখে পুরে আমার লোহার সিন্দুকটা জাপটে ধরেছি। এদিকে ভুস করে জাহাজটি ডুবে গেছে। আমি কিন্তু ঠিক ভেসে আছি; চুম্বকের টানে লোহার সিন্দুক আমার ঠিক ভাসতে-ভাসতে গিয়ে ডাঙায় ঠেকেছে। আমি টপাস করে বালিতে লাফিয়ে পড়েছি আর অমনি হুজুর—আমার সেই লোহার সিন্দুক, আমার অনেক টাকার সিন্দুক হুজুর, অনেক-কষ্টে-ঠকিয়ে-নেওয়া হীরে-জহরতে-ভরা সিন্দুক হুজুর, বোঁ করে উড়ে পালিয়েছে—উড়ে-মেড়োদের সেই মন্দিরের চুড়োয়!' —বলেই সিন্ধবাদ মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদতে লাগল।



আমি সিন্ধবাদের হাত ধরে উঠিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে টুলে বসিয়ে বললেম, ‘সিন্ধবাদ, শোনো। জানো আমি হারুন-অল-রসিদ, আমার সামনে মিথ্যা কথা বললে তোমার মাথা কাটা যাবো জানো!’

সিন্ধবাদ বললে, ‘জানি হুজুর, সেইজন্যেই তো আমার দুঃখু! সব সত্যি বলতে হল হুজুর, একটি মিথ্যা কথা দিয়ে এবারকার গল্পটা সাজাতে পারলুম না। ওরে আমার লোহার সিন্দুক!’ —বলেই সিন্ধবাদ টুল থেকে ঘুরে পড়েছে। একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। মসুর অমনি তাড়াতাড়ি তার মুখে জল দিতে এসেছে। আমার ভারি রাগ হল, মসুরকে এক লাথি মেরে বললুম, গাধা! আগে ওর মুখ থেকে সিন্দুকের চাবিটা এইবেলা বার করে নে। জেগে উঠলে কি আর দেবে?

মসুর অমনি সিন্ধবাদের মুখে আঙুল দিয়ে বলছে, ‘কই কত্তা চাবি তো পাইনে!’

‘পাসনে কি রে, দেখ জিবের নিচে!’

‘পাইনে তো কত্তা!’

‘দেখ্, দেখ্, গলায় আটকেছে!’



'চাবি তো নেই কত্তা।'

'খেয়ে ফেলেছে রে গাধা, খেয়ে ফেলেছে, পেট চিরে দেখ পাজি!'

মসুর অমনি ঝট করে তার পেট চিরে ফেলেছে আর দেখি পেটের ভেতর বজ্জাত সওদাগর তার লোহার সিন্দুকের চাবিটা লুকিয়ে রেখেছে! নিশ্চয় আমার কাছে মিথ্যা কথা বলত—'যেমন আল্লা বলে কেঁদেছি হুজুর, অমনি চাবিটাও উড়ে পালিয়েছে।'

মসুর চাবিটা গোলাপ জলে ধুয়ে আমার হাতে এনে দিলে। আমি মসুরকে হুকুম করলুম, আমার সেই উড়ো-সতরঞ্চি আর মুড়ো-দূরবীনটা আনতে—যাতে পাখির মতো উড়ে-উড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াই আর সগ্‌গ-মত্ত-পাতালের জিনিস ঘরে বসে দেখি।

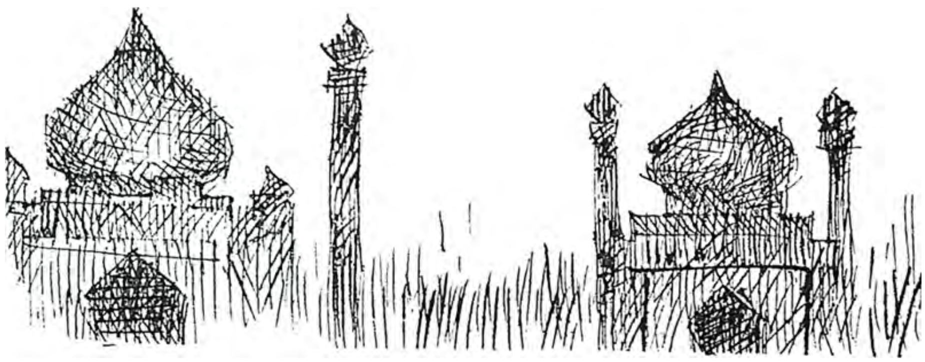
সতরঞ্চি আসতেই আমি তার ওপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দূরবীন হাতে উঠে বসেছি, মসুরও আমার পায়ের কাছে বসেছে—পা টেপবার জন্যে। যেমন হুকুম দেওয়া—চলো কালাপানি! অমনি সতরঞ্চি আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। তামাক খেতে গিয়ে হাতের কাছে নল পাইনে! মসুরটা এমনি গাধা যে গুড়গুড়িটা তুলে নিতে ভুলে গেছে। ভাগ্যি পকেটে কটা সিগারেট ছিল, তাই রক্ষে! মসুরও বেঁচে গেল, আমিও তামাক খেয়ে আরাম পেলুম।

বোগদাদ থেকে বেরিয়ে ঘণ্টাখানেক এসেছি কি না, এমন সময় মসুর বলছে, 'হুজুর, একটা কালো মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে, ঠিক ওই ডানদিকে।'

তাড়াতাড়ি দূরবীন কষে দেখি সেটা মক্কার মসজিদ। মসুর এত বড় মসজিদ কখনো চক্ষেও দেখেনি। সে তো অবাক।

আবার খানিক পরে কাফ্রিস্থানের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি। তখন মসুরের হাসি দেখে কে। সে বলছে, 'ওই দেখা যাচ্ছে সাহারা, হুজুর! ওটা একটা সমুদ্দুর শুকিয়ে গিয়ে চড়া পড়ে গেছে। ওরই ওদিকে দেখুন একটুখানি নোনা জল, তারই ওপারে ফিরিঙ্গি মুলুক আর আমাদের রূপের বাদশার কস্তুনতুনিয়ার কেল্লা দেখা যাচ্ছে। ওই দেখুন হুজুর, বালির ওপর দিয়ে সার-বেঁধে উটের কাফিলা চলেছে; ওই খেজুরতলায় ফালহানি জল তুলছে, ওই মিসির শহর আর ওই দেখুন সেকেন্দ্রিয়ার কুতুবখানা, হুজুর! ওখানে দুনিয়ার কেতাব জমা আছে। হুজুর ওই যে দেখেন দুটো পব্বতের মতো, ও দুটো হচ্ছে কাফ্রিস্থানের বাদশার কবর। এত বড় কবর আর জগতে নেই। কেবল সোনা-রুপো-হীরে-জহরতে ঠাসা আর তারই মাঝে সব মরা মানুষ শুয়ে আছে—হাজার বরষ ধরে, তবু তাদের দেখে মনে হয় যেন এই মরেছে, নয়তো ঘুমিয়ে আছে।

কিমিয়াবিদ্যার জোরে এখনো হাজার-হাজার বরষের মরা মানুষগুলো। টাটকা রয়েছে হুজুর! যদি দেখতে চান তো নেমে চলুন।'



আমি মসুরকে ধমকে বললুম, 'ওসব জীনের কারখানা আমি দেখতে চাইনে। ওদিকে ওটা কি দেখা যাচ্ছে?'

'হুজুর ওটা নীল নদী, ওখানে নীলপদ্ম পাওয়া যায়। হিন্দুদের যমুনা—আর কাফ্রিদের ওই নীল নদী! হুজুর, ওর ওপর একবার নৌকোয় করে হাওয়া খেয়ে দেখুন, দিল্ খুশ হয়ে যাবে। ওই নদীর ধারে আমার বাড়ি দেখা যায়, ওই আকের খেতের ধারে হুজুর, ওই আমাদের বুড়ো গাধাটি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে হুজুর! আমি হিন্দুস্থানে হীরে-জহরতের খোঁজে যেতে চাইনে, আমাকে আমার দেশের এই আকের খেতে ছেড়ে দিয়ে যান হুজুর!'

আমি দেখলেম বিপদ। মসুরকে ছাড়লে আমার তো একদণ্ড চলবে না। তামাক দেয় কে? পা টেপে কে? হিন্দুস্থানে একলাই বা যাই কি করে—সিন্ধবাদের জহরত লুঠ করতে?

আমি মসুরকে কিছু না বলে সতরঞ্চির ওপরে পুব-মুখো হয়ে ঘুরে বসেছি—হিন্দু রাজাদের মতো। এতক্ষণ আমি মোছলমানি কেতা-মতো পশ্চিম-মুখো বসেছিলুম, সতরঞ্চিও তাই পশ্চিম-মুখো চলছিল; পুব-মুখো বসতেই সতরঞ্চি পুবে ঘুরেছে আর হু-হু করে নীল-নদী পেরিয়ে একেবারে সিস্তান ঘুরে ইস্পাহানে হাজির। সেখানে বুলবুল-বোস্তাঁর ঝাঁক, হাফেজের গান গাইতে-গাইতে আমাদের সঙ্গে সব উড়ে চলেছে; মাটি থেকে সিরাজি সরবত আর ইস্তাম্বুল আতরের খোসবো আসছে। আমারও তেষ্টা পেয়েছে—মসুরেরও খিদে লেগেছে; দুজনে একটা মেওয়ার বাগানের ধারে আকাশ থেকে নেমে এসেছি। মসুরকে দুটো মোহর ফেলে দিয়েছি—দু-বোতল সিরাজি সরবত আনতে। মসুরটা এমনি গাধা! দেখি, খানিক পরে দু-মোহর দিয়ে এক ঝাঁক বেদানা আর আঙুর এনে হাজির!

'সিরাজি কই রে? কতকগুলো শুকনো বেদানা নিয়ে এলি যে!'

'হুজুর, খোদাবন্দ, জাঁহাপনা! সিরাজি আর পাওয়া যাবে না। দোকানে যে কটা ছিল, একা মসুর—হুজুরের পেয়ারের গোলাম এই মসুর—তা শেষ করেছে!'

ভারি রাগ হল, ধাঁ করে মসুরের নাকে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলুম। মসুরটা সিরাজি খেয়ে একেই টলছিল, ঘুঁষি খেতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। মেওয়ার ঝাঁকাটা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে, আর দেখি তার ভেতর একটা

সিরাজির বোতল। আমি সেটা কুড়িয়ে মসুরকে বললুম, 'মসুর, যেমন আমার সঙ্গে চালাকি তেমনি থাক তুমি এইখানে পড়ে, আমি চললুম!' বলেই যেমন আকাশে উড়তে যাব আর মসুর ধরেছে আমার গুড়-গুড়িটা চেপে, আর বলছে, 'হুজুর, আমি মসুর হুজুর, কসুর মাপ করুন হুজুর, আমি আপনার পুরোনো চাকর হুজুর, গুড়গুড়ি হুজুর, পায়ের জুতো হুজুর, গোলামের গোস্তাখি মাপ হোক হুজুর।'

গুড়গুড়ি যায় দেখে মসুরকে সেবারের মতো সঙ্গে তুলে নিলুম। তখন আকাশের ওপর দিয়ে সতরঞ্চি হু-হু করে উড়ে চলেছে। দেখতে-দেখতে কাবুল ছাড়িয়ে কান্দাহারে পৌঁচেছে। মসুর বলছে, 'হুজুর মেওয়াগুলো ফেলে আসা হল—অমন বেদানা।'

আমি অমনি কান্দাহারের একটা মেওয়ার বাগানে সতরঞ্চি নামিয়েছি; সেখানে মানুষের মাথার মতো এক-একটা বেদানা ফলে আছে। মসুর তো দেখেই অবাক।

'কেমন মসুর, এমন বেদানা কখনো দেখেচিস?'

'হুজুর, না!'—বলেই মসুর একটা বেদনা ভেঙেছে আর অমনি চারদিক থেকে কাবুলিওয়ালা মোটা লাঠি-হাতে তেড়ে এসেছে। আমি অমনি মসুরকে টেনে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠেছি; মসুর তো রেগেই লাল। বলে, 'হুজুর, কেন পালিয়ে এলেন? কাবুলিদের আচ্ছা করে ঘা-কতক দিয়ে আসতুম!'

আমি মসুরকে সাবধান করে দিয়ে বললুম, 'মসুরকে সাবধান করে দিয়ে বললুম, 'মসুর, খবরদার আর এমন কাজ কোরো না। মসুর, ওরা যদি আজ তোমাকে ধরতে পারত তবে মমিয়াই করে ছেড়ে দিত, জানো। মমিয়াই দেখেছ মসুর?'

'হ্যাঁ হুজুর, হাকিমসাহেবের কাছে যে কালো মলম তাকেই তো বলে মমিয়াই!'

'হ্যাঁ, ঠিক তোমার মতনই কালো। মমিয়াই হয় কিসে জানো?—কালো মানুষের চর্বিতে।'

'সে কি হুজুর!'

'হ্যাঁ, শোন তবে—কাফ্রিদের ছেলে কিম্বা যে-কোনো কালো ছেলে কিম্বা দুষ্টু যদি সুন্দর ছেলে হয় তাদের ওই কাবুলিওয়ালারা ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঝুলির ভেতর পুরে এনে একটা মেওয়ার বাগানে ছেড়ে দেয়। সেখানে মনের আনন্দে ছেলেগুলো বেদানা কিসমিস খোবানি আঙুর খেয়ে বেড়ায় আর মোটা হতে থাকে; শেষে মোটা হতে-হতে তাদের গা থেকে চর্বি গড়াতে থাকে, তখন সেই কাবুলিওয়ালাদের হাকিম একটা আগুনের কুণ্ডুর ওপর গরম-জল চাপিয়ে সেই মোটা ছেলেগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে মুরগির মতো নিচে মুখ ওপরে পা করে ঝুলিয়ে রাখে; আগুনের তাতে তাদের সেই চর্বি গলে টপটপ করে সেই কড়ায় পড়তে থাকে। যতক্ষণ একফোঁটা চর্বি থাকবে ততক্ষণ কিছুতে তাদের ছেড়ে দেবে না—তাতে তারা মরুক আর বাঁচুক। এমনি করে মমিয়াই তৈরি হয় মসুর। তোমার মতো মিশকালো ওরা কটা পায়? ধরতে পারলে আজ আর তোমার রক্ষা ছিল না; নিশ্চয়ই মমিয়াই করে ছেড়ে দিত।' ভয়ে দেখলুম মসুরের ঠোঁট শাদা হয়ে গেছে, ঘুরে পড়ে আরকি! আমি তাকে একটু সিরাজি খাইয়ে ঠান্ডা করলুম।

বলতে বলতে পেশোয়ারে এসে পড়েছি। সেখানে সন্ধে হয়েছে কিন্তু কাবুলিওয়ালার ভিড় দেখে মসুর কিছুতে সেখানে রাত কাটাতে চাইলে না। আমি কত বোঝালুম যে এখানে ইংরেজের রাজ্য—কাবুলিদের কিছু উৎপাত করার জো নেই, কিন্তু মসুর কিছুতে বুঝল না। কাজেই আরো এগিয়ে উড়ে চলতে হল; একেবারে দিল্লির কুতুবমিনারে এসে সতরঞ্চি নামালুম। মসুরটা এমনি ভয় পেয়েছে যে দিল্লির চাঁদনিচকে গিয়ে দুটো

দিল্লির লাড্ডু কিনে আনতেও তার সাহস হল না। কি করি, আমরা কুতুবমিনারের চুড়োয় সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। চাঁদ না উঠলে অন্ধকারে আর ওড়া যাবে না।

রাত নটার সময় চাঁদ উঠল। অত বড় চাঁদ—এমন পরিষ্কার চাঁদ হিন্দুস্থান ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এই চাঁদনিতে দিল্লির চাঁদনিচক আলো হয়ে গেছে; রাস্তায় সব লোক বেরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, গান-বাজনা করছে। মসুর দেখি দিল্লির জুম্মা-মসজিদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

'দেখছ কি মসুর?'

'হুজুর, এমন মসজিদ কোথাও দেখিনি।'

'তবু মসুর, ওর আধখানা রেল-কোম্পানি ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছে!'

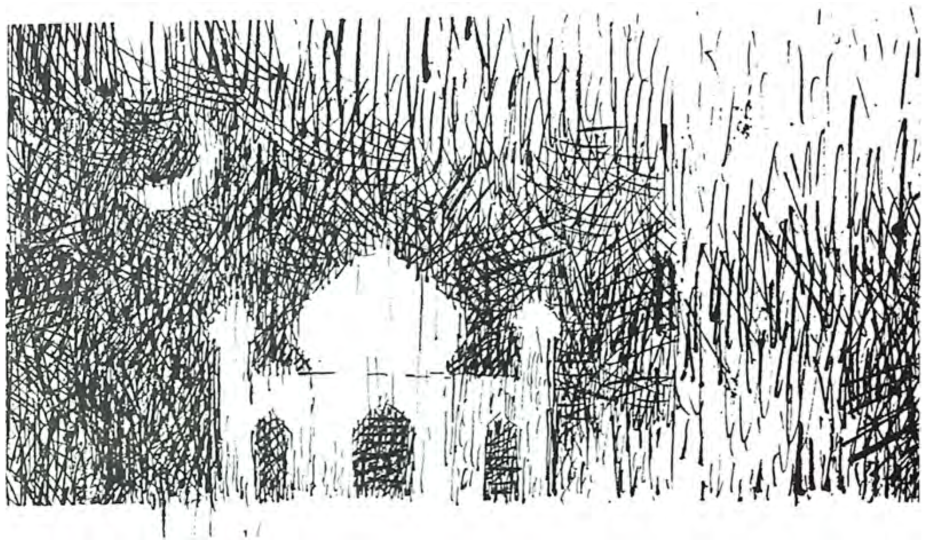
'ওটা কি হুজুর?'

'ওটা শাজাহান বাদশার কেল্লা। ওখানে একটা দরবার-ঘর আছে, সে দেখলে চোখ ঠিকরে যেত—এত হীরে-মানিক দিয়ে সেটা সাজানো ছিল। সেইখানে ময়ূর-সিংহাসনে বাদশারা বসে দরবার করতেন।

'ছিল বলছেন কেন হুজুর? এখন কি সে-সব নেই?'

'না মসুর, শুনেছি ময়ূর-সিংহাসন নাদির শা কেড়ে নিয়ে কাবুলে চলে গেছে, আর দেয়ালে যে-সব হীরে-পান্না ছিল তা মোগল-বাদশারা বাড়ি ছাড়বার পর কাঁচ হয়ে গেছে। আসল কথাটা কি জানো মসুর, ও দেয়ালে কাঁচই লাগানো ছিল কিন্তু মোগল বাদশার ভয়ে লোকে বলত সেগুলো হীরে-মানিক! নইলে অত টাকা গরিব হিন্দুস্থানের বাদশা শাজাহান কি করে পাবে? এ কি বোগদাদের বাদশা হারুন-অল-রসিদ যে ঘরখানা হীরে দিয়ে মুড়ে ফেললে? আমি বেশ জানি মসুর, বুড়ো শাজাহান এক তাজমহল আর ময়ূর-সিংহাসন তৈরি করতে সব টাকা, যা-কিছু তার বাপ-দাদা জমিয়ে গিয়েছিল, ফুঁকে দেয়। সেই রাগে তার ছেলে ঔরঙ্গজেব তাকে কয়েদ করে সিংহাসন কেড়ে নেয়—এ আমার উজির জামায়ের নিজের মুখ শোনা, নিজের কানে শোনা, জানো মসুর—'

মসুর দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে; আমার কিন্তু ঘুম আসছে না, দিল্লির হাওয়া বড় গরম লাগছে। আমি আস্তে-আস্তে কুতুবমিনারের ওপর থেকে নেমে বাদশাদের একটা তহ্‌খানার ভেতরে গিয়ে ঢুকেছি। মাটির নিচে তহ্‌খানা, তার চারদিকে জলের ফোয়ারা। এখন আর ফোয়ারার জল উঠছে না, কিন্তু তবু ঘরখানি বেশ ঠাণ্ডা।



খানিক বসে থাকতে-থাকতে শুনেছি ঢং-ঢং করে রাত বারোটা বাজল। অমনি দেখি সব ফোয়ারাগুলো খুলে গেছে—আর ফরফর করে গোলাপজলের ছিটে আমার গায়ে পড়ছে। তহ্‌খানার মাঝখানে একটা মখমলের বিছানা ছিল, আমি তারি ওপর শুয়ে একটু চোখ বুজেছি আর দেখি বুড়ো ঔরঙ্গজেব একটা লাঠি ধরে ঠকঠক করে এসে হাজির! এসেই আমাকে লাঠির খোঁচা দিয়ে বলছে, 'কৌন্ হায় রে?' আমিও অমনি তার মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি, 'তুম্ কৌন্ হায় রে?'

'হাম্ হিন্দুস্তানকি মালিক ঔরঙ্গজেব বাদশা হ্যায়!'

'ম্যায়নে তুর্কিস্তানকে পাশা হারুন-অল-রসিদ নবাব খাঞ্জা খাঁ খাঁজাহান-ই-জাহান্দার শা বাদশা বেগদাদি হুঁ!'

'আও লড়েঙ্গে!'

'আও লাড়ো!'

বলেই আমরা দুজনে তাল ঠুকতে-ঠুকতে পাঞ্জা কষতে-কষতে একেবারে কুতুবমিনারের ওপরে এসে হাজির। সেখানে এসে বুড়ো ঔরঙ্গজেবটা আমাকে এমনি জাপটে ধরেছে যে ফেলে আরকি ঠেলে ওপর থেকে নিচে! এমন সময় মসুর ছুটে এসে মেরেছে তার মাথায় এক কিল। যেমন কিল মারা অমনি তার পাগড়িটা পড়েছে ঠিকরে লাহোরের কেল্লায়। সেখানে রণজিৎ সিং খাটিয়া পেতে ছাতে ঘুমুচ্ছিল; পাগড়িটা পড়বি তো পড় একেবারে তার মুখের ওপরে, আর পাগড়ির কোহিনুর হীরেটা গেছে তার একটা চোখে বিঁধে!

এদিকে ঔরঙ্গজেবটা তার খালি মাথায় হাত বুলুচ্ছে, ওদিকে রণজিৎ সিং একগাল হাসতে-হাসতে কোহিনুর হীরেটার দিকে একচোখে চেয়ে আছে, আর আমরা সতরঞ্চি চালিয়ে একেবারে আগ্রায় এসে হাজির হয়েছি। দেখি অজবিবির কবরটার চারদিকে বুড়ো শাজাহানটা কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সেখান থেকে সোজা ফতেপুর শিক্রির দিকে সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম। আমার ছেলেবেলার বন্ধু আকবর সেখানে পঞ্চমহলের ওপরে বসে চতুরং খেলায় মত্ত ছিল। আমাকে দেখে ভারি খুশি। 'এস ভাই বোগদাদি!' বলে আমায় পাশে বসালে। তার সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়া, তাই সে আমাকে বলে বোগদাদি, আমি বলি তাকে আগারওয়ালা।

অনেকদিনের পর দুজনের দেখা। দেখি আকবর কেমন বুড়িয়ে গেছে। চুল সব শাদা হয়ে গেছে। গোঁফ-দাড়ি সব ফেলে দিয়ে লোকটা কেমন যেন কাটখোট্টা-রকমের দেখতে হয়ে গেছে। তার আর সে চেহারা নেই।

দুজনে অনেকক্ষণ ছেলেবেলায় গল্প করে আমি বললুম, 'তবে এখন আসি ভাই, অনেক দূর যেতে হবে।'

'আঃ বোলো না। মসুর কিছু খেয়ে নিক। ওরে, মসুরকে ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে নিয়ে আয়। আর ভাই, বুড়ো-বয়েসে মনের সুখ নেই। বড় ছেলে জাহাঙ্গিরটা হয়েছে বেজায় মাতাল, কাজকর্ম কিছুই দেখে না, সেই এলাহাবাদের কেল্লায় বসে কেবল টাকা ওড়াচ্ছে। ভেবেছিলুম নাতি শাজাহানটা একটা মানুষের মতো মানুষ হয়ে বংশের নাম রাখবে, কিন্তু ভাই আমার কপালের দোষে নাতবৌ ম'রে ইস্তক স্ত্রীর শোকে সেও গেল পাগল হয়ে।ঔরঙ্গজেবটা এদিকে চালাকচতুর, কিন্তু হিঁদুদের ওপর তার বিষদৃষ্টি। হিঁদু প্রজা নিয়েই আমার কারবার, অথচ তাদেরই সে চটাতে চায়। এমন কল্লে কি রাজত্ব থাকে দাদা? আমি সেই ষোলো বছর থেকে আজ পর্যন্ত যা-কিছু জমিজমা টাকাকড়ি করেছি সব আমার কটা নাতি-পুতি মিলে বরবাদ কল্লে দেখছি। কি যে করব ভেবে পাইনে। এখন ভালোয়-ভালোয় মানে-মানে মরতে পারলে বাঁচি ভাই বোগদাদি।'

আমি বললেম, 'দেখ জাহাঙ্গির যতই মাতাল হোক, ও তোমার রাজ্য একরকম চালিয়ে নেবে; শাজাহানও যতই পাগলামি করুক কিন্তু দেখ একদিন তোমার নাম রাখবে; ছেলেটি বেশ ধীর, শান্ত, বুদ্ধিমান। কিন্তু ওই যে তোমার শাজাহানের ছেলে ঔরঙ্গজেবটি, ওটি ভাই, তোমার গোলাপবাগে কাঁটাগাছ। ও তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। আমার সঙ্গে পথে আসতে তার দেখা হয়েছিল, একেবারে গোঁয়ার! আমি বেশ করে তাকে শিক্ষা দিয়ে এসেছি।'



‘বেশ করেছ ভাই বোগদাদি! তুমি শিক্ষা না দিলে আর দেবে কে! দেখ, তুমি তো এলাহাবাদ হয়ে যাবে, পার তো জাহাঙ্গিরকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মদ খাওয়াটা ছেড়ে যাতে সে এখানে এসে একটু কাজকর্ম দ্যাখে সেইটে কর ভাই।’

‘আচ্ছা তাই হবে।’ বলে মসুরকে নিয়ে আবার সতরঞ্চি উড়িয়ে চললুম, যমুনার কিনারা দিয়ে। যাবার আগে আগারওয়ালা ছেলেদের জন্যে একরাশ পাথরের খেলনা সতরঞ্চিতে তুলে দিলে।

তখন রাত প্রায় দুটো। এলাহাবাদে পৌঁচেছি। ভেবেছিলুম জাহাঙ্গির ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু গঙ্গা-যমুনার ওপরে নৌকোর পুলের কাছে এসে দেখি কেল্লাটা একেবারে আলোয় আলোময়; এক ক্রোশ থেকে মদের গন্ধ, গানবাজনার আওয়াজ, আর আতর-গোলাপের খোসবো পাওয়া যাচ্ছে। কেল্লায় একটা জলসা দেখে আমাকেও একটু সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে নিতে হল। তারপর একেবারে গিয়ে জাহাঙ্গিরের খাস মজলিসে হাজির।

জাহাঙ্গির আমাকে দেখেই থতমত খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে একেবারে নূরজাহানের কাছে নিয়ে বললে, ‘অনেক পথ এসেছেন, এইখানে বিশ্রাম করুন; আমার বন্ধুবান্ধবদের বিদায় করে আমি এলেম বলে!’ বলেই জাহাঙ্গির সরে পড়ল।

আমি নুরজাহানকে বললেম, ‘দেখ, আমায় এখুনি আবার রওনা হতে হবে, জাহাঙ্গিরের সঙ্গে আজ রাতে আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, কালও হয় কিনা সন্দেহ। তোমায় একটি কথা বলে যাই—জাহাঙ্গিরকে একটু সাবধান হয়ে সম্ঝে চলতে বল, নইলে তোমার শ্বশুর তাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করবেন বলেছেন। তোমার শ্বশুর আমাকে এই পাথরের খেলনাগুলো দিয়েছেন; এগুলো তুমি নিয়ে খেলা কর। আমি এসব নিয়ে কি করব? এখন তবে আসি।’ —বলে আমি আবার সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম।

মসুরটাকে আমি গাধা বলি কিন্তু সে একেবারে নির্বুদ্ধি নয়। এরই মধ্যে সে জাহাঙ্গিরের ভিস্তিখানা থেকে পোয়াটাক খাস অম্বুরী তামাক যোগাড় করেছে। মসুরটাকে বাহাদুরি দিতে হবে। কিসে আমার কষ্ট না হয় সেদিকে তার খুব নজর আছে।

ভোর নাগাদ একটু চোখ বুজেছি কি না অমনি মসুর ‘হুজুর, দেখুন! দেখুন!’ বলে ঠেলে তুলেছে। দেখছি ডানা উঠলে পিঁপড়েগুলো যেমন মাটি ছেড়ে ঘুরে-ঘুরে আকাশের দিকে ওঠে, তেমনি দলে-দলে ষাঁড় হু-হু করে উত্তর দিকে উড়ে চলেছে, আর দক্ষিণ দিকে কেবল গাধা টঙ্গস-টঙ্গস করে লাফাতে-লাফাতে চলেছে।



এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! এত গরু, এত গাধা আসে কোথা থেকে? দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দেখছি একটা নদী আধখানা চাঁদের মতো বেঁকে চলেছে তারই দুই পারে দুই শহর; একটা শহরে কেবল হিঁদুদের মঠ আর মন্দির, পূজারি পাণ্ডা গুণ্ডা আর সন্ন্যাসীর আড্ডা, আর একদিকে কেবল যত মোটা-মোটা লক্ষপতি ক্রোরপতি—তাদের বড়-বড় মোটা-মোটা থাম-দেওয়া বাড়ি আর যত টিকিধারী সভাপণ্ডিতদের বাসা! এই দুই শহরের মাঝে দুটো বড়-বড় চিতা জ্বালানো রয়েছে, আর শহরের যত লোক দিন-রাত কাঠের বোঝা, তেলের কুপো এনে সেই চিতায় ঢালছে। যেমন এক-একবার আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠছে আর অমনি লোকগুলো তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর অমনি একদল গরু হয়ে বেরোচ্ছে, আর অন্য দল গাধা হয়ে দৌড় দিচ্ছে! এমন সময় দেখি দুপার থেকে দুটো হিঁদুদের বুজরুগ আমাদের হাত নেড়ে ডাকাডাকি করছে—'গোলোকে যাবে গো? গন্ধর্বলোকে যাবে গো?'

জাফরের মুখে শুনেছিলুম এরা নতুন মানুষ পেলেই ভেড়া বানিয়ে দেয়। আমি আর তাদের দিকে না দেখে বোঁ-করে সতরঞ্চি চালিয়ে দিয়েছি! একেবারে গঙ্গা-পার হাবড়ার পুল কলকেত্তা হাজির! মসুরটা তো আজব শহর কলকেত্তা দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি মসুরকে বললুম, 'এখানে বুজরুগি বড় কম চলে না—মানুষ ধরে এরা পাঁঠা করে রাখে, আর সময়মতো সেগুলোকে বলি দিয়ে বাজারে তাদের মাংস বিক্রি করে, নিজেরাও পাঁঠার ঝোল বেঁধে খায়।' বলতে-বলতে দেখি দলে-দলে ছেলে-বুড়ো যত বাঙালি—কেউ কানে কলম গুঁজে, কেউ কেতাব বগলে—'ওই দেখা যায় বরানগর, সামনে কাশীপুর, কলকাতা কদ্দুর।'

বলতে-বলতে ছুটে এসে এক-একটা বড়-বড় কেতাবখানা দপ্তরখানায় গিয়ে ঢুকছে। বেশ মনের ফুর্তিতে, কিন্তু বেরিয়ে আসছে দেখি এক-একটা বোকা ছাগল!

'মসুর, জানো একে বলে কামরূপ কামিখ্যে ভেল্কিবাজি। আর এই শহরে বাঙলার যত বড়-বড় বুজরুগের আসল আড্ডা। ওই দেখ গড়ের মাঠে একটা যাদুঘর, আর ওই আলিপুরে একটা চিড়িয়াখানা, আর ওই পুবদিকে দিঘির ধারে একটা গোলামখানা। আলিপুরে মানুষ-পাঁঠা জিয়োনো থাকে, ওই গোলামখানায় তাদের পোষ মানায়, আর মরবার পরে ওই যাদুঘরে তাদের হাড়গুলো আর ছালগুলো জমা রাখে। এখানে পা দিয়েছ কি বোকা বনেছ!' —বলেই আমি একদণ্ড আর সেখানে না থেকে একেবারে কালাপানির দিকে সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম।

আকাশের ওপর দিয়ে পাখির মতো শোঁ-শোঁ উড়ে চলেছি, দেখি বাঙলাদেশের বুজরুগ তাদের দূরবীনগুলো উঠিয়ে আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

'কাজটা ভালো হল না, মসুর! সবাই আমাদের দেখে ফেললে, এতক্ষণে কালাপানিতে টেলিগ্রাম গেছে যে আমরা ওই মুখেই চলেছি। সেখানে গেলেই পুলিশ লাগবে পিছনে, তখন সিন্ধবাদি হীরেটাই দখল করা শক্ত হবে। মসুর এস, এইখানেই নেমে পড়া যাক। এইখান থেকে বেশ বদলে, রেলে করে উড়েদের সেই মন্দির পর্যন্ত যাওয়াই ভালো।'

বলে আমরা রূপনারায়ণ নদীর ধারে নেমে তল্পিতল্পা বেঁধে হেঁটে গিয়ে রেলে চড়লুম। আমি হলুম হীরানন্দ বাবাজি আর মসুর হল কিচকিন্দা—আমার উড়ে চেলা। গাড়িতে দেখি কেবল মাড়োয়ারি, মাদ্রাজি আর বাঙালি। বাবাজি দেখে তারা আমাকে আদর করে বসালে, কত কথা পুছতে লাগল। জবাব দিতে পারিনে; কাজেই আমি সাজলুম বোবা আর মসুর হল কালা। আর কোনো গোল রইল না।

ছ-মাস পুরীতে আছি, রোজ মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু চুড়োর ওপর কোথায় যে সিন্দবাদের সিন্দুকটা গিয়ে আটকে আছে তার আর সন্ধান পাইনে। শেষে একদিন একটা ফন্দি মাথায় এল। মসুরকে বললুম, 'দেখ্ মসুর, প্রায়ই দেখি এক-একটা লোক ওই মন্দিরের চুড়োয় নিশেন বাঁধতে ওঠে, তুই ওদের দলে ভিড়ে যদি একদিন মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বেশ করে সিন্দুকটা কোথায় আছে দেখতে পারিস তবে তোকে একখানা হীরে বকশিশ দেব।'

মসুর প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, বলে, 'পড়ে মরব কত্তা!' কিন্তু শেষে দেখি একদিন গেছে! বেশ করে চুড়োটা দেখে মসুর এসে বলছে, 'কত্তা! সিন্দুক এখেনে নেই। ওই চুড়োর ওপর থেকে বিশ-ক্রোশ তফাতে আর-একটা মন্দির দেখা যায়, সেইখানে আমি পষ্ট দেখলুম সিন্দুকটা যেন পাথরের গায়ে ঝুলচে। কিন্তু অনেক দূরে কত্তা! এইখানে থেকে বালির ওপর দিয়ে ঠিক সোজা একেবারে পুব-মুখো যেতে হবে কত্তা।'

মসুরের কথাই ঠিক। আজ ছ-মাস দেখছি এই কালাপানি দিয়ে কত জাহাজ এল, গেল; কিন্তু একটি পেরেকও দেখলুম না যে এই মন্দিরে এসে লাগল। সেইদিনই রাত্তিরে সতরঞ্চি উড়িয়ে একেবারে মসুরের সেই মন্দিরে হাজির। গিয়ে দেখি মন্দিরের সব আছে কেবল চুড়োটি নেই।

'যাঃ! সর্বনাশ হয়েছে মসুর! সিন্দুক সরিয়ে ফেলেছে মসুর! এত কষ্ট করে আসা বৃথা হল মসুর!' বলেই মসুরও অচৈতন্য।

যখন আবার চোখ খুলেছি দেখি একটা ছোট ঘরে কে আমাদের বন্ধ করে গেছে—একটি পিদিম আর এক ঘড়া জল দিয়ে। দেখি পিদিমের কাছে একটা বাক্স রয়েছে। বাক্সটা লোহার, আর তার ওপরে পেতল দিয়ে লেখা রয়েছে—'সিন্ধবাদ'। তাড়াতাড়ি বাক্সটা টেনে নিয়ে খুলতে যাব, দেখি পকেটে চাবিটা ছিল সেটা কে চুরি করেছে!

'মসুর, চাবি নিলে কে? নিশ্চয় তোর কাজ!'

'না কত্তা, চাবি তো আমি নিইনি।'



'মিথ্যেবাদী, পাজি!'—বলেই সেই লোহার বাক্সটা ছুঁড়ে মেরেছি। যেমন মারা আর অমনি মসুর —'বাপরে!' বলে ঘুরে পড়া; আর বাক্সটা খটাং করে খুলে একটা একবেগ্‌দা মানুষ বেরিয়ে এসে আমার সুমুখে দাঁড়াল।

এ কি, সিন্ধবাদ যে! হাতে তার সেই চাবিকাঠিটি। সিন্ধবাদ সামনে এসেই বলছে, 'কি হারুন-অল্‌-রসিদ! —হীরানন্দ বাবাজি! সিন্ধবাদের হীরে পেলে কি? চাবিটা তো তার পেট থেকে খুঁজে বার করলে! এখন হীরেগুলোও বার কর।'

'আমার সঙ্গে তামাশা!' —বলেই যেমন সিন্ধবাদকে ধরতে গেছি আর সে একেবারে চম্পট! যেন নিভে গেল!

আমার বড় ভয় হল; এত বুজরুগি কাটিয়ে এসে শেষে কি উড়ে বুজরুগের পাল্লায় পড়লুম!'

'মসুর! কথা কোসনে যে মো-সু-উ-র?'

মাথার ওপরে চামচিকে কিচ্‌কিচ্‌ করে বলছে, 'মঁসুর কি আর আঁছে সেঁ কালো কিঁচকিন্দে মঁরে ভূঁত হয়ে গেঁছে, এই অন্ধকারে তোঁমাকেও ভূত হয়ে থাকতে হঁবে। হিঁঃ-হিঁঃ-হিঁঃ।' —বলেই চিকচিক করে আমার চারদিকে অন্ধকারে উড়ে বেড়াতে লাগল।

মসুরটা হঠাৎ মরে গিয়ে আমায় ভারি বিপদে ফেলে গেল! তার মতন এমন নেমকহারাম চাকর আমি দেখিনি!

রাগে দুঃখে আমি গোঁ হয়ে বসে আছি; চামচিকেটা ঘুরতে-ঘুরতে যেমন আমার হাতের কাছে এসেছে আর অমনি আমি খপ করে তাকে ধরে ফেলেছি। ধরেই দেখি সেটা সেই এক-বেগদা সিন্ধবাদ!

'তবে রে পাজি! এখন তোকে কে রাখে! বল্‌ কোথায় হীরেগুলো রেখেছিস? নইলে তোকে ওই সিন্ধুকে বন্ধ করে কালাপানির জলে ফেলে দেব!' বলেই আমি তার হাত থেকে বাক্সের চাবিটা কেড়ে নিলুম।

তখন সিন্ধবাদ আর কি করেন? চুপি-চুপি আমাকে যেখানে তার হীরে-জহরতগুলো পোঁতা আছে সেই জায়গাটার নাম বলে দিল।

'জায়গাটা কোথায় জানো?'

'চামচিকেটা যদি আমায় আগে সেটা বলত তবে আমাকে এত কষ্ট পেতে হত না। জায়গাটা হচ্ছে ওই—সে কি-বলে-কি—সেই যেখানে জগন্নাথের যত যাত্রী ঘুরপাক দেয়!'

'অক্ষয় বট?'

'আরে না বাবু, গাছটাছ সেখানে কোথা!'

'তবে দোলমঞ্চ হবে।'

'সেখানে তো দুলতে হয়। ঘুরতে হয় কোথায়?'

'তবে "চানবেদী!"

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওরই কাছাকাছি, ঠিক মনে হচ্ছে না এখন, খানিক বাদে মনে হবে।' —বলেই হারুন্দে চুরুট ফুঁকতে লাগল!'

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করি, 'হারুন্দে, নামটা মনে পড়ল কি? আমায় যে ভারি শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে কোথায় হীরেগুলো লুকোনো আছে।'

কথা নেই!

'বলি ও হারুন্দে, মনে পড়ল কি?'

'একটু-একটু পড়ছে।'

'বলে ফেল।'

'রোসো বলছি—"ল" না-না, "র" আর "ন"; "র" হল না তো! "র" আর "ন"র মাঝে কি হয় বাবু?'

‘কি হয় হারুন্দে?’

মনে পড়ছে না। মসুর, “র” আর “ন”র মাঝে কি হয়? ওহো তুই কেমন করে জানবি? তোকে তো আমি সেই লোহার বাক্সতে পুরে জলে ভসিয়ে দিলুম। “র” আর “ন” তার মাঝে হল—’

‘তোমার মাথা আর মুণ্ডু! শোনো কেন বাবু, ও পাগলের কথা। ও চিরকালই হারুন্দে, কোনো কালে হারুন-অল্-রসিদ নয়। ওর বাপ ওকে লেখাপড়া শেখাতে কলকাতায় পাঠিয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর ইতিহাস, পারস্য উপন্যাস আর ডিটেকটিভ গল্প পড়ে-পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কখনো এক টুকরো ইতিহাস, কখনো উপন্যাস, দু ছত্তর বা কবিতা, দুটো বা সত্যি কথা, দশটা বা মিছে কথা। কখনো হাততালি দিচ্ছে, কখনো গালাগালি। মাথাটা যেন বাংলা খবরের কাগজ—মূল্য দুই পয়সা মাত্র! আমি কিচকিন্দে এই কিচকিন্দায় থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম, সিন্ধবাদকে তো কখনো এ তল্লাটে দেখিনি। একটা কথা বললেই হল—সিন্ধবাদ এল, চুম্বকে তার সিন্দুক টেনে নিলে! জাহাজ টেনে নেয় এত বড় চুম্বক-পাথর—সে পাথর গেল কোথায়?’

হারুন্দের কথা নেই।

‘দেখলে বাবু, গল্পের খেই ধরতে জানে না, গল্প বলতে আসে। ও তো সেদিনের ছেলে। গল্পের ও জানে কি? বোগদান-ফোগদাদ তো সেদিনের কথা; সত্য ত্রেতা দ্বাপর, কলি—এই চার যুগের গল্প আমি জানি। গল্প শুনতে চাও তো শোনো—’

কিচ্‌কিন্দের গল্প

সত্যযুগের মানুষ যজ্ঞডুমুরের গাছের সমান লম্বা ছিল, ত্রেতাযুগের লঙ্কা গাছ, দ্বাপরে ভাণ্ডীর, আর কলিতে লজ্জাবতী। এরপর মানুষ ক্রমে এত ছোট হয়ে যাবে যে শেষে আঁকশি দিয়ে তবে তাদের বিলিতি-বেগুনের গাছ থেকে বেগুন পাড়তে হবে।

সেই ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র অবতীর্ণ হলেন—রাক্ষস-বংশ ধ্বংস করতে অর্থাৎ যেখানে বাঁশবন ছিল সেখানে লঙ্কাচারা আর বোম্বাই-আম বসাতে; যাতে মানুষ বোশেখ-জোষ্টি মাসে আমকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি খেয়ে বাঁচতে পারে। বিশ্বাস না হয়, কাসুন্দে আর ঝালুন্দেকে প্রশ্ন কর।

এখন রামচন্দ্র জন্মালেন, কিন্তু লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে রাক্ষস তাড়ানো তো তাঁর কম্ম নয়। এক-লাফে সমুদ্রই পার হয় কে? আজেই হনুমান এই কিষ্কিন্ধ্যায়,—ওই যে মনসাতলার ঘাটে কাঁটাবন ওইখানে—জন্ম নিলেন। এদিকে হনুমানও জন্মেচেন আর ওদিকে রথে চড়ে সূর্যিমামা দেখা দিয়েছেন। মামার মুখটি যেন পাকা আমের মতো। দেখেই হনুমানের লোভ হয়েছে, এক লাফে মামার কোলে ঝাঁপিয়ে উঠেছেন। মামা—'হনু! হনু!' —বলে আদর করে যেমন ভাগ্নেকে চুমু খেতে গেছেন আর হনু দিয়েছেন মামার গালে এক কামড়! —'ওরে গেলুম, গেলুম! ছাড়, ছাড়!' —আর ছাড়!

এমন সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন যাচ্ছিলেন আকাশ দিয়ে। মামা-ভাগ্নের ঝগড়া দেখে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন বজ্জর। যেমন বাজ পড়া আর হনু 'রাম! রাম!' করতে-করতে ঠিকরে গিয়ে পড়েছেন ওই রামচণ্ডীতলায়; আর সূয্যিমামা রথশুদ্ধ পড়েছেন ওই চন্দ্রভাগার কাছে কালিদয়ে বালির পাঁকে। মামার রথের চুড়োটা মচাৎ করে ভেঙে পড়ল ঘোড়া কটা কন্দকাটা হয়ে বালির পাঁকে আটকা পড়ে গেল—মায় সহিস কোচম্যান লোকলস্কর দাসী চাকর! যে যেখানে ছিল সবাই আড়ষ্ট যেন পাথর!

সূয্যিমামা কালিদয়ে দইকাদা মেখে গড়াতে-গড়াতে ডাঙায় গিয়ে উঠলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি ঐরাবত-হাতি নিয়ে মামাকে তুলতে যেমন এসেছেন অমনি গেল ঐরাবতও দয়ে পড়ে। কি করেন? তখন হনুমানকে ডাকাডাকি। হনুমান এসে দু-বগলে দুজনকে নিয়ে তবে স্বগ্‌গে পৌঁছে দেন। সেইদিন থেকে সূয্যিমামা আর

রথে চড়ে বেড়াতে গেলেন না, পায়ে হেঁটেই আনাগোনা করেন। সিন্ধুঘোটকটা ভাগ্যি ছিল, তাই চড়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন হাওয়া খেয়ে বেড়ান।

একদিন ইন্দ্রদ্যুম্ন ঘোড়ায় চড়ে এই সমুদ্দুরের ধারে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় সিন্ধুঘোটকের একটা পা গেছে বালিতে বসে। আর ঘোড়া নড়ে না। ইন্দ্রদ্যুম্ন ঘোড়ার পা ধরে টানাটানি করতে ঘোড়ার পা-টা গেল ছিঁড়ে। তিনি আর কি করেন, সেই খোঁড়া ঘোড়ায় ন্যাংচাতে-ন্যাংচাতে ছিষ্টিকত্তা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হাজির। গিয়েই ব্রহ্মাকে বলছেন, 'আমার আর-একটা ঐরাবত-হাতি আর উঁচু ঘোড়া না হলে চলছে না। দেবতাদের রাজা হয়ে শেষে কি পায়ে হেঁটে বেড়াবো? আমার মান থাকে কেমন করে?'

ব্রহ্মা বললেন, 'আমি বারে-বারে তোমাদের জন্যে ছিষ্টি করতে পারিনে, যাও নারদের ঢেঁকিটা চেয়ে নিয়ে চড়ে বেড়াও। হাতিঘোড়া পেয়ে যে যত্ন করে রাখতে পারে না তার ঢেঁকি চড়ে বেড়ানোই ঠিক।

ছিষ্টিকত্তার কাছে তাড়া খেয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের কাছে হাজির। নারদ বুদ্ধি দিলেন : 'দেখ ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুমি হলে রাজা, ঢেঁকি চড়া তোমার শোভা পাবে না, লোকে হাততালি দেবে, তার চেয়ে যাও তপস্যা করগে, ছিষ্টিকত্তা খুশি হয়ে তোমাকে দুটো কেন দশটা হাতিঘোড়া ছিষ্টি করে দেবেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার ছেলে, তপস্যার নাম শুনেই ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তখন নারদ বুদ্ধি দিলেন, 'যাও ইন্দ্রদ্যুম্ন! রামচন্দ্রের কাছ থেকে রাবণের পুষ্পক-রথটা চেয়ে নাও।'

ইন্দ্রদ্যুম্ন এসে রামচন্দ্রকে ধরে বসলেন। রাম বললেন, 'রাবণের রথ কেড়ে নেওয়া তো সহজ নয়, তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাও তো হতে পারে। কিন্তু রাবণ যদি চিনতে পারে যে দেবতা, তা হলে তোমার বিপদ।'



ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, 'আজ্ঞে, আমরা বাঁদর সেজে রাবণের সঙ্গে লড়ব।'

রামচন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু।'

তারপর রাম-রাবণের যুদ্ধ। হনুমান হলেন যত বাঁদরমুখো দেবতাদের সেনাপতি; আর আমি কিচ্‌কিন্দে হলুম—কিচ্‌কিন্দের দলে যত উড়ে, তাদের সেনাপতি। এই দুই দল নর-বানর—এদেরই কিত্তি কিত্তিবাসি রামায়ণে লেখা আছে। সে তো তুমিও জানো?

তারপর বলি শোন—রাবণের কাছ থেকে পুষ্পক-রথ তো কেড়ে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় এসেছেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন রথটি নিয়ে যান আর কি, এমন সময় সূয্যিমামা এসে বলছেন, 'বাপু রাম, ইন্দ্র বজ্জর ফেলে আমার রথটি গুঁড়ো করেছেন, এখন পুষ্পক-রথটি উনি নিলে আমি দু-বেলা আপিস করি কেমন করে! উনি রাজার ছেলে ঘরে বসে থাকলে চলে, কিন্তু সকাল-সন্ধে আমাকে যে এই সারা পৃথিবী ঘুরে আলো দিয়ে বেড়াতে হয়, আফিস-গাড়ি নইলে আমার চলবে কেন?'

হনুমান ছিলেন বসে রামের কাছে, তিনি অমনি বলছেন, 'ইন্দ্র আমাকেও বজ্জর মেরে দফারফা করেছিল আরকি! কেবল রামনামের জোরে বেঁচে আছি!'

'কী, রামদাসকে মারা! ইন্দ্রদ্যুম্ন, যাও রথ তোমায় দেব না!' বলেই রাম সূয্যিমামাকে রথটা দিয়ে দিলেন।

ইন্দ্র মুখ-চুন-করে ফিরে যান দেখে রামচন্দ্রের দয়া হল, তিনি হনুমানকে ডেকে বললেন, 'হনু, তুমি ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে যাও, যেখানে ইন্দ্রের সিন্ধুঘোটকের ছেঁড়া পা-খানি উদ্ধার করে গন্ধমাদন থেকে বিশল্যকরণীর পাতার আঠা দিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের খোঁড়া ঘোড়া জোড়া দিয়ে দাওগে।'

তখন হনুমানকে নিয়ে সমুদ্দুরের ধারে ইন্দ্রদ্যুম্ন হাজির। সেখানে তখনো সিন্ধু-ঘোটকের ছেঁড়া পা-খানা বালির ওপরে লটপট করছিল—হনুমান সেই পা ধরে দিয়েছেন এক টান, আর অমনি বালির নিচ থেকে হড়হড় করে একটা মন্দির বেরিয়ে এল।

হনুমান তো ঘোড়ার পা-খানা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে রেখে বিশল্যকরণীর পাতা আনতে যান, এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন মাসির বাড়ি থেকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে এনে সেই মন্দিরে পুজো লাগিয়ে দিয়েছেন। হনুমান এসে দেখেন মন্দির দখল। তখন হনু রেগেই লাল! বলে, 'আমি বিশল্যকরণীর পাতা দেব না। আমার মন্দির, আমি রামচন্দ্রকে এখানে বসাব মনে ছিল। তুমি কেন জগন্নাথকে বসালে?'

বড় গোলযোগ দেখে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে আনতে ছুটলেন। ব্রহ্মা এসে বললেন, 'হনুমান, যিনি জগন্নাথ, তিনি রঘুনাথ। তুমি গোল কোরো না আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

সেই দিন থেকে প্রতি বছর রামনবমীর দিন জগন্নাথের রঘুনাথ-বেশ করে পুজোর ব্যবস্থা হল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, 'ছিষ্টিকত্তা, আমার ঠাকুরের কি বেশ হবে তার ব্যবস্থা করুন।'

ব্রহ্ম ব্যবস্থা করলেন—পাবন্ধি-বেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন তো ঘোড়ায় চড়ে স্বগ্‌গে যান আর হনুমান রাবণের মধুবন থেকে যে আমের আঁঠিটি সীতাদেবীর হাত থেকে পেয়েছিলেন, সেটিকে একটা বাগানে বসিয়ে দিলেন। দেখতে-দেখতে সেই বাগান এক আমবন হয়ে উঠল আর হনুমান সেই বনের ভেতরে দলবল নিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে আরামে রইলেন।

এই তো গেল ত্রেতাযুগে—মানুষ যখন লঙ্কাগাছের মতো, তখনকার কথা। এখন সত্যিযুগের কথা বলতে বল তো বলি—কিন্তু সেটা ভয়ানক সত্যি, গল্পের মজা তাতে নেই, যেন বাঙলার ইতিহাস পড়ার মতো সব

ঠিক-ঠিক একেবারে ঠিক।

বলেই কিচ্‌কিন্দে সত্যিযুগের কথা আরম্ভ করেছে—

‘সত্যে ব্রহ্মঙ্ক কর যাত-অ-অ,
সত্য স্ব-রূ-প তু অনন্ত।
সত্যে তোহার আত্ম যাত-অ-অ
আত্মে জ-নি-লু তোর সত্য,
তোর সঞ্চিলা সেয়ল-অ-অ-অ
অসুর মারি সাধু পাল-অ-অ-অঃ
জগত তোর দেহুঁ যাত-অ-অ,
থিতি পালন করুঁ অন্ত।
তোহ মায়ারে মূরু-খ জন-অ-অ,
আত্মাকু দেখন্তি সে ভিন্ন।
পণ্ডিতে জানন্তি সে-এক-অ-অ,
মায়ারে দিশই অনেক
তু এ সংসারে দুঃখ সুখে-এ-এ
শরীর বহু নানা রূপে
সাধুকু দিশই নি-র-ম-ল-অ-অ
খল-লোচনে যম কাল-অ-অ-অঃ।’

‘ও কিচ্‌কিন্দে, থাক! তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না। আর কোনো কথা থাকে তো বল।’

‘সত্যিযুগের সব কথাগুলোই ওই রকম দাড়িওয়ালা মুনি-গোঁসাইগুলোর মতো গোম্‌সা-মুখো। আচ্ছা শোনো। দ্বাপরযুগে রাখাল-ছেলে ভাণ্ডারীগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে আর গরু-বাচুর তার চারদিকে নেচে-নেচে গান গাইছে :

‘কি সুন্দর মুরলী পা-নী রে সজনী।
তাঙ্কু কে দিব অন্তা আ-নি-রে-এ সজনী।
দিনে যমুনাকু মু যেবে গলি গাধোই
বাটরে দেখিলি মু প্রাণ মাধো-ই রে সজনী।
বাঙ্ক-বাঙ্ক করি মো তে দেলে অনাই
তরকী-তরকী মু অইলি প-লা-ই রে সজনী।
ধাঁই-ধাঁই সে যে মো ধইল লাঙ্গলে-এ
মু ভেঁই পড়িলি যাই যমুনা জলে-এ রে সজনী।’

বলেই কিচ্‌কিন্দে ফুঁ-ফুঁ করে একটা বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করে দিলে।

'বলি ও কিচ্‌কিন্দে, গানের চেয়ে তোমার বাঁশিটি কিন্তু মিষ্টি।'

যেমন এই কথা বলা অমনি কিচ্‌কিন্দে বাঁশি রেখে বলে উঠেছে : 'Thank you Baboo, I earnestly hope and trust that the noble example of this most enlightened and public spirited Kumar Krishna Kich Kinda of Orissa will be followed by all Maharajas, Rajas, Jamindars and other wealthy people—not only in India but throughout the length and breadth of Bengal, Behar & Orrissa—for the amelioration of self and friends and all the poor gentlemen at large like হারুন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে অ্যাণ্ড মালুন্দে।'

'ও কি বলচ কিচ্‌কিন্দে?'

'কলির কথা। —ধন্যবাদ তোমাকে বাবু, আমি ব্যগ্রভাবে ভরসা ও প্রত্যয় করিতেছি যে ঐ কুলীন উদাহরণ এই আলোকসম্পন্ন সাধারণ ভূতবান উড়িষ্যার কুমার কৃষ্ণ কিচ্‌কিন্দার হইবে অনুগমিত সকল রাজা মহারাজা জমিদার ও যোত্রসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারাই নিজের বন্ধুর এবং হারুন্দে ইত্যাদির মতো বেচারা গরিব এবং ছাড়া-পাওয়া ভদ্রগণের অপেক্ষাকৃত ভালো করিবার নিমিত্তে।'

'এ কথার তো কিছু মানে-মাথা নেই কিচ্‌কিন্দে।'

'আচ্ছা কথার তো কিছু মানে-মাথা নেই কিচ্‌কিন্দে।'

'আচ্ছা শোনো দেখি, এটার কিছু মানে পাও কিনা—বঙ্গ-বিদর্ভনগর লৌবর্ত্ম সমিতি। এটা আরো শক্ত? আচ্ছা দেখ দেখি এটা সহজ কিনা—পূর্ণপরব্রহ্মজ্যোতিস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে পূর্ণরূপে নিষ্ঠাবিহীন জীব বাহিরে ভিন্ন-ভিন্ন নামরূপ দেখিয়া বহির্মুখী মনোবৃত্তির দ্বারা বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সত্য হইতে বিমুখ হয় ও মিথ্যার আসক্তি করতঃ কলির ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে—'

'এটা তো একেবারে সমস্কৃত, একটুও বোঝবার জো নেই।'

'তবেই তো বাবু, কলিকালের কথার নমুনা দেখেই ভড়কে গেলে। গল্পটা আগাগোড়া শোনা তোমার কম্ম নয়। ভাণ্ডীরবনে রাখাল-ছেলের বাঁশির গানটুকুই তোমার অদেষ্টে লেখা ছিল।'

বলেই আবার কিচ্‌কিন্দে বাঁশি বাজাতে লাগল:

মু ভেঁই পড়িলি যাই যমুনা জলে-এ রে সজনী।

বাঁশি শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ইতিমধ্যে কখন যে পালকি সুদ্ধ কিচ্‌কিন্দে আমাকে সমুদ্দুরের জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে তা জানিনে। ঝপাং করে যেমন এক ঢেউ এসে পালকিতে লেগেছে আর ঘুম ভেঙে গেছে।

'ও কিচ্‌কিন্দে, কোথায় নিয়ে চললে? পিসির বাড়িতে চল না—এদিকে কেন?'

'বাবু, পিসির বাড়ি কি এখানে? সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে যেতে হবে।'

'জাহাজ কই কিচ্‌কিন্দে? পার হব কেমন করে?'

'জাহাজ কি করবে বাবু? জন্ম-জন্ম ধরে জাহাজ চালিয়ে গেলেও পিসির বাড়িতে যেতে পারবে না। জলের ওপর দিয়ে পিসির বাড়ি যাবার রাস্তা নেই, যেতে হবে জলের নিচে দিয়ে—ডুব-সাঁতার মেরে, সাত ঘাটের

জল খেতে-খেতে। পিসির বাড়ি যাওয়া কি সহজ বাবু!

'তাই তো কিচ্‌কিন্দে, ডুব-সাঁতার তো আমি জানিনে, কেমন করে তবে পিসির বাড়ি যাই!'

'পিসি তো তাই আমাদের পাঠিয়েছেন। ভয় কি? গট্ হয়ে পালকিতে বসে থাকো, এইখান থেকে এক ডুব মারব আর ঠেলে তুলব পালকি এক্কেবারে পিসির বাড়ি। কিন্তু দেখ বাবু, রাস্তার মধ্যে অনেক আশ্চয্যি দেখতে পাবে দেখে যেন ভয় খেও না। প্রথমে আসবেন কালা-কানা-আংলা-টানা, তারপর আছেন গামলা-চালা ফোঁপরা-জালা, তার পরে ঘণ্টাকর্ণ রক্তশোষা মাথায়-ছাতা, তার পরে শাঁখচূর্ণি মুক্তোকলাই, তারপর আছেন শুঁড়-দুল্ দুল্ কাঁচুমাচু কল-কব্‌জা দাড়া-বাঁধা, আর রাঘববোয়াল পায়রা-চাঁদা।'

'কিচ্‌কিন্দে, এরা যদি আমায় ধরে?'

'কিছু ভয় নেই। আমরা আছি। ভয় পেলে আমায় ডেকো।' বলেই—'হ্যে রে রে দাদা রে' বলে পালকি-সুদ্ধু আমাকে নিয়ে তারা ডুব মেরেছে জলের ভেতর।

প্রথমটা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনে। খানিক পরে দেখি ফুঁকো শিশির মতো ছোট-ছোট আলো জলের ভেতর দুধারে সারি-সারি ঝুলছে। এক-একবার জলের তোড়ে আলোগুলো হুড়হুড় করে গড়িয়ে ডাঙার দিকে যাচ্ছে আবার গড়গড় করে গড়িয়ে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে আসছে। এমন সময় দেখি, এক কড়া তেল জলের ওপর যেমন ভাসতে-ভাসতে চলে তেমনি কি-একটা আমাদের দিকে পিছলে-পিছলে আসছে! অমনি কিচ্‌কিন্দে ডেকেছে, 'সামাল! সামাল! বাঁয়ে ধর ভাই!'

সাঁ করে আমরা বাঁ-দিকে একটা ডোবার ভিতর নেমে গেছি। সেখান থেকে দেখি— তেলটা ভাসতে-ভাসতে আমাদের ঠিক মাথার ওপরে এসে চারদিকে চারটে লম্বা-লম্বা আঙুল বার করে জল খুঁটতে লাগল। তারপর আবার আস্তে-আস্তে আঙুল-কটা গুটিয়ে নিয়ে একদিকে ভেসে চলে গেল।

কিচ্‌কিন্দে বললে, 'দেখলে বাবু, উনিই হচ্ছেন কালা-কানা-আংলা-টানা। ওঁর না আছে মাথা মুখ, না আছে কান, না আছে চোখ; থাকবার মধ্যে আছে কেবল এক আঙুল আর একরাশ তেল-চুকচুকে পেট। আঙুলটি গিয়ে কারো গায়ে ঠেকেছে কি আর অমনি সমস্ত পেটটি তেলের মতো গড়িয়ে গিয়ে তার ওপর পড়েছে—যেমন পড়া আর অমনি হজম করে ফেলা! জানোয়ার যদি ওঁর চেয়ে তিন-চার ডবল বড় হয় তবে ঐ পেটটিও সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে তেলের মতো ছড়িয়ে গিয়ে জানোয়ারটিকে বেশ করে ঘিরে নেয়!'

'ছুটি দিয়ে পিটটা চিরে দেওয়া যায় না কিচ্‌কিন্দে?'

'হবার জো নেই। ওঁকে দু-টুকরো কর, দশ-টুকরো কর, একশো-হাজার-টুকরো কর, দেখবে সব টুকরোগুলো একটা-একটা নতুন কালা-কানা-আংলা-টানা ভুল বার করে ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্দুরের ভেতর এঁর মতো জবরদস্ত আর কেউ নেই বাবু। চল এই আংলা-টানার হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই।' —বলেই আমরা চুপি-চুপি পালিয়ে চলেছি। এমন সময় দেখি একরাশ চিনেমাটির মার্বেল জলের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। কাছে আসতে দেখি—সেগুলি এক-একটি গোল খাঁচা আর ভেতরে একটি করে খুদে আংলা বসে আছে।

'ও কিচ্‌কিন্দে, আমাকে চাট্টিখানি ওই মার্বেল ধরে দাও না।'

'দেখ না একবার ধরে!' —বলেই খপ করে দুটো মার্বেল ধরেই কিচ্‌কিন্দে আমার দু-হাতে দিয়েছে। তেমন মুঠো করে ধরা আর শুঁয়োপোকার কাঁটার মতো হাতময় ছুঁচ বিধে গেছে!

মার্বেল দুটো ফেলে দিয়ে দুহাত চুলকোতে-চুলকোতে চলেছি, এমন সময় কিচ্‌কিন্দে বলছে, ‘গামলা-চালা ফোঁপরা-জালার দেশে এলুম বাবু!’

চেয়ে দেখি চারদিকে কেবল গামলা আর জালা! কোনোটা বড়, কোনোটা ছোট, কোনোটা লম্বা, কোনোটা বেঁটে, কেউ ধানের মরাইটার মতে, কেউ ঢাকাই জালাটার মতো, কেউ চুমকি ঘটিটির মতো। কোনো গামলা ফুলের টবের মতো দাঁড়িয়ে আছে, কোনোটা বা গরুর জাব দেবার ফুটো গামলাটার মতো উল্টোনো রয়েছে!



‘এ-সব গামলা আর কুপো কেন কিচ্‌কিন্দে?’

‘জানো না? এখানে তোমার পিসির ঘি-তেল মজুদ থাকে। দেখ না’ —বলেই ছোট একটি ঘিয়ের মট্‌কি কিচ্‌কিন্দে আমার হাতে তুলে দিয়েছে।

‘ও কিচ্‌কিন্দে, এ ভাঁড়টার মুখ কোন দিকে? ঘি বার করি কেমন করে?’

‘দাও, দেখিয়ে দিই। বলে মট্‌কিটা আমার হাত থেকে নিয়ে কিচ্‌কিন্দে দুহাতে নিংড়োতেই দেখি গল্‌-গল্‌ করে এক সের ঘি বেরিয়ে পড়ল!

‘এ তো বেশ মজা!’ বলেই আমি পালকি থেকে নেমে সেই জালা আর গামলাগুলো টিপতে লাগলুম আর অমনি পিচকিরি দিয়ে ফোয়ারার মতো কোনোটা থেকে তেল কোনোটা থেকে ঘি বেরোতে লাগল। দেখতে-দেখতে চারদিক তেল আর ঘিয়ে ভেসে গেল! তখন কিচ্‌কিন্দে বলছে, ‘বাবু, আর খেলা নয়। এত তেল-ঘি ঢেলে ফেলেছ দেখলে পিসি রাগ করবেন। চল, চুপি-চুপি পালাই।’

পালকি করে আবার চলেছি। কিন্তু মনে ভয় হচ্ছে—পিসির এত তেল-ঘি ঢেলে নষ্ট করলুম, পিসি যদি টের পান তো রক্ষে রাখবেন না।

'ও কিচ্‌কিন্দে, পিসিকে বোলো না যেন যে অত তেল-ঘি নষ্ট করেছি!'

'একটুও নষ্ট হবে না বাবু, পিসির তোমার তেমন জালা, তেমন গামলা নয়! কুপোগুলো সব তেল-ঘি আবার শুষে নিয়ে যেমন ছিল তেমনি ফুলে উঠছে! চল এখন পিসির বাড়ির তেতলায় আমরা নেমে যাই। সেখানে ঘন্টাকর্ণ রক্তশোষা মাথায় ছাতা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!' বলেই কিচ্‌কিন্দে পালকি নিয়ে ধাপে-ধাপে সমুদ্দুরের নিচে নেমে চলল। সেখানটা এমন অন্ধকার যে কিছু দেখা যায় না।

'ও কিচ্‌কিন্দে, তেতলায় তো সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয়, এ যে তুমি আমাকে নিয়ে নেমে চললে।'

'ঠিক যাচ্ছি বাবু! জলের ওপরে যে তেতলা বাড়ি তাতে উঠতে হলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যেতে হয়, আর জলের নিচে যে বাড়ি তার তেতলায় যেতে হলে নিচেবাগে নেমে যেতে হবে। জলের ভেতরে যে বাড়ি কি বাগানের গাছ দেখ, সেগুলোর মাথা ওপরে থাকে না নিচেতে থাকে?'

'নিচেবাগে।'

'জলের ওপরে যে বাড়ি থাকে তার মাথা কোন দিকে থাকে?'

'ওপর দিকে।'

'তবে? জলের ওপরে তোমার মাসির বাড়িতে যা করতে নিচে পিসির বাড়িতে এসে ঠিক তার উল্টোটা না করলে মুশকিলে পড়বে, এইটে মনে রেখ।' বলেই কিচ্‌কিন্দে ক্রমে আরো নিচে নেমে চলল।

'ও কিচ্‌কিন্দে, চোখে যে কিছুই দেখতে পাইনে, বড় অন্ধকার!'

'আলো বেশ আছে, কেবল তুমি চোখটি খুলে রেখেছ বলে কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। চোখ বন্ধ কর, সব স্পষ্ট দেখতে পাবে।'

কিচ্‌কিন্দের কথায় চোখ বন্ধ করেছি। সবাই চোখ-চেয়ে দেখে, আমি দেখছি চোখ বুজে—নীল জল! এত নীল যেন নীল কালি! তারই মাঝে গোনা যায় না—এত ঘন্টা দলছে! ঘন্টার গায়ে ছোট-ছোট গোল-গোল কত যে চোখ জ্বলছে তার ঠিক নেই—কোনোটা লাল, কোনোটা হলদে! গোলাপি সবুজ শাদা বেগুনি—কত রঙেরই চোখ! ঘন্টাগুলোর দুদিক দিয়ে দুটো করে লম্বা শুঁড়ের মতো কান ঝুলছে! যেমন এক-একবার সেই কানগুলোতে ঢেউ লাগছে আর অমনি সব ঘন্টাগুলো হেলে-দুলে টুং-টাং ক্লিং-ক্লাং টুং-টাং করে বাজছে—ঠিক যেন গোঁসাই এসে কানের কাছে মন্তর দিচ্ছে

পালকির কাছ দিয়ে যখন এক-একবার ঘন্টাকর্ণ এক-একটা হেলতে-দুলতে চলে যাচ্ছে তখন ইচ্ছে হচ্ছে—দিই একবার দুই কান ধরে টেনে। কিন্তু তখনি আবার মনে পড়ে যাচ্ছে এখন সব উল্টো কাজ করতে হবে; যখন ইচ্ছে হবে চোখ বুজে ঘুমোই তখন থাকতে হবে চোখ চেয়ে; যখন ইচ্ছে হবে শুই তখন হবে দাঁড়াতে; যখন কান মলতে হাত এগিয়ে যাচ্ছে তখন হাতকে জোর করে পিছিয়ে আনতে হবে। কাজেই আমি ভালো-মানুষটি হয়ে চুপ করে হাত-পা-গুটিয়ে চোখ বুজে বসে রয়েছি। এমন সময় দেখি আমাদের মেজ পুঁটির মতো একটি মাঝারি গোছের পুঁটিমাছ ঝাঁ করে গিয়ে ঘন্টাকর্ণের কানে দিয়েছে ঠোকর। যেমন কান ছোঁয়া আর কান অমনি জড়িয়ে ধরেছেন হাতির শুঁড়ের মতো পুঁটিমাছটিকে! যেমন ধরা অমনি ঘন্টার ভেতর পোরা! কাঁচের

হাঁড়িতে পোষা মাছ যেমন ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়, তেমনি দেখছি ঘণ্টার ভেতর পুঁটিমাছটি ঘুরে বেড়াচ্ছে—পালাবার পথ নেই! আমি মাছটার কি হয় দেখবার জন্যে চেয়ে আছি।

'আর দেখছ কি বাবু! হজম হয়ে গেল বলে। যাও না ঘণ্টার কানটা ধরে টেনে দেখ না মজাটা।'

'কিচ্‌কিন্দে, তুমি কেমন করে জানলে যে কান মলবার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করছিলে, আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি।'

'বলনি বলেই জানতে পারলুম। বললে কিছু শুনতেও পেতুম না, জানতেও পারতুম না। এখানে সব উল্টো নিয়ম তা তো তোমাকে বলেই দিয়েছি।'

এই কথা হচ্ছে এমন সময় দেখি পাঁচ দিক থেকে পাঁচটা শুঁড় নাড়তে নাড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে—রক্তশোষা। তার সবটাই অগুনতি ঠোঁট আর গাল আর জিভ—লাল টকটকে, শাদা ফ্যাঁফ্যাঁকে। এক ক্রোশ থেকে তার ঠোঁট নাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে—পট্‌-পট্‌-পট্‌, চক্‌-চক্‌-চক্‌!

কিচ্‌কিন্দে ডাকছে, 'ডাইনে ধর ভাই, ডাইনে!'

বলতে-বলতে দেখি পালকি ডাইনে ঘুরেছে, আর দেখি রক্তশোষা বাঁদিকে সরে গেছে।

'বাঁয়ে ধর ভাই, বাঁয়ে ধর!'

পালকি যেমন বাঁদিকে ঘুরেছে আর দেখি রক্তশোষা ডাইনে চলে গেছে। এমনি ডাইনে বাঁয়ে করতে-করতে আমরা রক্তশোষার ঠোঁট এড়িয়ে ছাতা-মাথার ঘরে এসে পড়েছি। সেখানে দেখি কেবল ছাতা আর তার নিচে এক-একটা মুণ্ড—গুটিসুতোর মতো সোঁটা-সোঁটা চুল আর মুলোর পাতার মতো গোছা-গোছা দাড়ি। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন বিটপালং, গাজর, ওলকপি আর বিলিতি-মুলোর ঝাঁকা সব উল্টে পড়ে ভেসে যাচ্ছে।

'ও কিচ্‌কিন্দে! এরা কারা?'

'এরা মালী। তোমার পিসির সবজি-বাগানে কাজ করছে।'

'এত তরকারি কি পিসি একাই খান?'

'তিনি ছাড়া আর কে খাবে? এ তরকারি কারো ছোঁবার জো আছে! ছুঁলেই হাত চুলকে অস্থির হবে। যতক্ষণ না পিসি এগুলিকে নিজের হাতে বেঁধে-বেড়ে দেবেন ততক্ষণ কারো মুখে দেবার জো নেই। মুখে দিয়েছে কি আর গাল ফুলে গোবিন্দর মা হয়েছে!'

গালফুলো গোবিন্দর মা কে কিচ্‌কিন্দে?

'তিনি আগে গোবিন্দর মা ছিলেন, পিসির এই সবজি খেতে ওলকপি তুলতে এসে একটি বিলিতি মুলো চুরি করে খেয়েছিলেন, সেই থেকে তাঁর গাল ফুলে গেছে। গোবিন্দ আর তাঁর মায়ের মুখ দেখেন না।'

'আচ্ছা কিচ্‌কিন্দে, ওই যে টোকা মাথায় দিয়ে মালীরা সব এই সবজি-খেতে কাজ করছে ওদের গা কই চুলকোয় না কেন?'

'ওদের গা থাকলে তো! চুলকে-চুলকে সব ক্ষয়ে গেছে। এদিকে দেখ বাবু, তোমার পিসির ধানের খেত। এখানে কেবল মুক্তোকলাই, দশবছরে একবার ফলে, আর তোমার পিসি সেই কলাইয়ের ডাল দিয়ে পান্তাভাত দশবছর অন্তর একদিন খান।'

'পান্তাভাত কি কিচ্‌কিন্দে?'

‘ভিজে ভাত বাবু। তোমায় তো বলেছি এখানে সব উল্টো, ডাঙার ওপর মাসির বাড়িতে খাও তোমরা শুকনো ভাত আর জলের নিচে পিসির বাড়িতে সবাই খায় ভিজে ভাত। তোমাদের কলাইয়ের ডাল পাতলা—যেন জল, আর এখানকার কলাইয়ের ডাল যেন মুক্তোর মতো ঝুরঝুরে।’

এই কথা হচ্ছে এমন সময় শুনি খেতের ভেতর থেকে ভোঁ-ভোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল।

‘এত শাঁখ বাজে কেন কিচ্‌কিন্দে?’

‘শাঁখচূর্ণিরা সব শাঁখ বাজিয়ে কলাই-খেত থেকে পাখি তাড়াচ্ছে বাবু।’

দেখি, শাঁখচূর্ণিরা সব শাঁখ বাজিয়ে খেতময় ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের আর কিছু নেই—কেবল পাটি করে দাঁত আর একটা মস্ত কান, তাতে একটি ফুটো। জাঁতিকলের মতো দুপাটি দাঁত তারা খুলছে আর বন্ধ করছে, আর তাদের সেই কানের ফুটোগুলো দিয়ে ভোঁ-ভোঁ করে শাঁখের শব্দ বার হচ্ছে। কতদূর থেকে যে সে শব্দ শোনা যাচ্ছে তার ঠিক নেই!

শুঁড়-দুল-দুল কাঁচুমাচুর দেশ পেরিয়ে চলেছি, তখনো শুনছি সেই শাঁখের আওয়াজ! যেমন এক-একবার শাঁখের শব্দ আসছে আর অমনি দেখছি শুঁড়-দুল-দুলের যত শুঁড় সব ভয়ে কেঁচো হয়ে ল্যাজ গুটিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে গর্তে লুকোচ্ছে।

‘ও কিচ্‌কিন্দে, পিসি এত কেঁচো নিয়ে করেন কি?’

‘তিনি ওই কেঁচোর টোপ দিয়ে ছিপ ফেলে কাঁকড়া ধরেন।’

‘একটা ছিপ পাই তো গোটাকতক কাঁকড়া ধরি।’

অমনি দেখি মস্ত-মস্ত কাঁকড়া দাড়া নেড়ে-নেড়ে বলছে, ‘ধরো না দেখি! আঙুলটি কাটব নাকি? —কট্-কট্-কট্!

যাঃ-যাঃ ‘দূর হ!’

যত বলি ‘দূর হ’ ততই দেখি কাঁকড়াগুলো এগিয়ে আসে।

‘ও কিচ্‌কিন্দে এরা এগিয়ে আসে যে!’

‘আসতে বলছ তো আসবে না! যাঃ-যাঃ বললে এগিয়ে আসবে না তো কি পিছিয়ে যাবে? এখানে সব উল্টো, মনে নেই? বল—আয়-আয়।’

যেমন ‘আয়-আয়’ করে ডাকা আর অমনি সব কাঁকড়া দেখি পালিয়েছে। আমি যত ডাকি ‘আয়’ তত তারা দূরে পালায়। আবার যেমন একবার বলেছি ‘যাঃ-যাঃ’ অমনি সব কাঁকড়া কট্‌কট্ করে আমার দিকে ছুটে এসেছে!

‘আচ্ছা কিচ্‌কিন্দে, পিসি অত কষ্ট করে কেঁচোর টোপ ফেলে কাঁকড়া ধরেন কেন? জলের ধারে বসে যাঃ-যাঃ বললেই তো তারা আপনি পিসির হাতে উঠে আসত?

‘আহা, পিসির তোমার মায়ার শরীর, কাউকে কি তিনি যাঃ বলতে পারেন! পিসির মুখে যাঃ কথাটি কখনো শুনিনি। যদি বললুম—পিসি বাড়ি যাই, অমনি পিসি বলবেন—আয় বাছা! কোনোদিন বলবেন না—যা বাছা! তোমাদের মুখে যেমন যা-যাঃ দূর-দূর লেগেই আছে, পিসি তো আর তেমন নয়, পিসি সবাইকে বলেন—এসো বাছা, বসো বাছা! সাধে কি আমরা পিসির চাকর হয়ে আছি? ওই দেখ তোমার পিসির ছিপে একটা কল-

কব্‌জা-দাড়া-বাঁধা ধরা পড়েছে। ওই আর একটা! উঃ, তোমার জন্যে পিসি খুব কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি-ধরছেন দেখছি, কাল খাওয়া খুব হবে বাবু!'



দেখি পিসির ছিপে দুটো প্রকাণ্ড কাঁকড়া আর গলদা-চিংড়ি ধরা পড়েছে। কাঁকড়ার এক-একটা দাড়া আমার হাতের মতো লম্বা; আর চিংড়ি দুটো যেন এক-একটা তেলেঙ্গি সেপাই—ঢাল খাঁড়া নিয়ে তিড়িং-তিড়িং লাফাচ্ছে। আমাদের চোখ, মুখের সঙ্গে চ্যাপ্টানো, এদের চোখগুলো যেন দূরবীনের চোঙার মতো মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়েছে আর কট্‌মট্ করে তাকিয়ে আছে! দেখলে ভয়ে গা শিউরে ওঠে। কাঁকড়া আর গলদা-চিংড়ি দেখে, পিসির রাঁধা কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল, লাউ-চিংড়ি আর গুড়-অম্বল খেতে নোলা সকসক করে উঠল।

'ও কিচ্‌কিন্দে পিসির বাড়ি আর কতদূর?'

'এই তো এসেছি বাবু তোমার পিসির খিড়কি-পুকুরে। ওই দেখ কত রাঘব-বোয়াল আর পায়রা-চাঁদা মাছ পুকুরে ঠাসা রয়েছে।'

বাপরে! এমন সব মাছ তো কখনো দেখিনি! যেন এক-একটা জাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছে। কারো ভাঁটার মতো চোখ, কারো গাময় চাকা-চাকা আঁশ, কারো মাথার শিং, কারো গালে গোঁফ, কারো থোঁতা মুখ, কারু মুখ বা ছুঁচলো, কেউ লম্বা কাঠি, কেউ গোল একটি বেলুনের মতো! লাল নীল সবুজ কত রঙের কত রকমের যে মাছ পিসির পুকুরে ছাড়া রয়েছে—তা আর কি বলব! গল্প শুনতে-শুনতে যেমন ঘুম পায় তেমনি পিসির বাড়ির সাতঘাটের কাণ্ডকারখানা দেখতে-দেখতে আমার ঘুম পেয়ে এল।

'ও কিচ্‌কিন্দে, বড় ঘুম আসছে, আর যে চোখ বুজে থাকতে পাচ্ছিনে।'

'বেশ তো বাবু, ঘুমোও চোখ খুলে, আর তো দেখবার কিছু নেই, রাত পোহালেই এই পুকুরের ওপারে তোমার পিসির বাড়ি পৌঁছে দেব।'

আমি অকাতরে ঘুম দিচ্ছি এমন সময় শুনছি পিসি ডাকছেন, 'অবু, ও অবু, ওঠ্ রাত হয়েছে, আর কত ঘুমোবি? সূয্যি যে অনেকক্ষণ নেমেছেন।'

কিচ্‌কিন্দে বলছে, 'পিসিমা, দাদাবাবু সারাদিন পালকিতে ঘুমোননি, একটু ঘুমোতে দাও, এই তো সবে সূর্যি নেমেছেন, এখনো তো রাত বেশি হয়নি।'

কিচ্‌কিন্দের গলা পেয়েই আমার ঘুম ভেঙে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি— পিসির বাড়ির ছাদে শুয়ে আছি আর আকাশে একটা কালো সূর্যি উঠেছে। আমাকে উঠে বসতে দেখে কিচ্‌কিন্দে তাড়াতাড়ি বলছে, 'বাবা ঘুমোও, এখনো রাত হবার দেরি আছে, আর একটু রাত হোক তো জেগো।'

'রাত হলে তো ঘুমোব, তখন আবার জাগব কি?'

পিসি বলছেন, 'ও কপাল! রাতে বুঝি ঘুমোতে হয় আর দিনে জাগতে হয়? খবরদার রাতে ঘুমোসনে— অম্বল হবে, বাত হবে! যাই, রান্নাবান্না হল কিনা দেখে আসি'— বলে পিসি তো গেলেন। কিচ্‌কিন্দে তখন আমায় বলছে, 'বাবু ভুলে গেলে? তোমাকে তো বলেছি। পিসির দেশে রাতে সূর্যি ওঠেন, দিনে চাঁদ। যা মাসির বাড়ি করতে এখানে ঠিক তার উল্টোটি করা চাই, মাসির বাড়ি যদি ঘুমোই রাতে তো এখানে ঘুমোব দিনে, সেখানে যদি চান করি জলে, এখানে করতে হবে বালিতে। খাবার সময় সেখানে যদি বলতে মাসি খিদে পিয়েছে ভাত দাও, এখানে বলতে হবে পিসি খিদে নেই, পেট আইঢাই করছে, ভাত আজ দিও না, খাব না। সেখানে বই পড়তে চোখ খুলে বইখানা সামনে রেখে, এখানে পড়তে হবে চোখ বন্ধ করে বইখানা পিছনে লুকিয়ে রেখে।'

'কিচ্‌কিন্দে এ-সব শিখতে তো আমার অনেকদিন লাগবে।'

'তা লাগবে বই কি বাবু! আজ দিনটা একটু পিসির বাড়ি আরাম কর, কাল রাতেই তোমাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দেব; সেখানে লেখাপড়া খুব ভুলতে পারবে।'

এমন সময় পিসি এসে ডাকছেন, 'ভাত আজ আর খেও না।'

কিচ্‌কিন্দে তাড়াতাড়ি এক ঘটি বালি এনে দিলে, আমি তাই একটু মুখে দিয়ে পিসির রান্নাতলায় হাজির। এদেশে রান্নাঘর নেই, খোলামাঠে উনুন পাতা আছে, তারই কাছে দেখি খাবার জায়গা। সেখানে একখানা মস্ত কলাপাতা পাতা রয়েছে, আসন-টাসন কিছুই নেই! আমি যেমন কলাপাতার সামনে মাটিতে বসতে গেছি আর পিসি বলছেন, 'ওরে ওখানে না, ওই পাতাখানায় বোস্।'

'পিসি, পাতায় আমি বসব তো ভাত দেবে কিসে?'

'এই যে পিঁড়িতে ভাত বেড়ে রেখেছি'—বলে একটা পিঁড়ের ওপরে ডাল ভাত তরকারি সাজিয়ে পিসি আমাকে এনে দিলেন। আমি তখন বুঝলুম, এখানে লোকে পাতায় বসে আর পিঁড়েয় ভাত খায়! পিসির হাতের কলাইয়ের ডাল আর কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে একপেট ভাত খেয়ে জলের ঘটিতে চুমুক দিয়ে দেখি এক ঘটি বালি—বেশ পরিষ্কার, তাতে আবার গোলাপের গন্ধ ছাড়ছে, আর বেশ মিষ্টি। ঢক্‌ঢক্ করে এক ঘটি বালি খেয়ে ধুলোয় হাত-মুখ ধুয়ে উঠলুম। পিসি একটি পান দিলেন—শুকনো যেন তালপাতা। আমরা খাই কাঁচা পানের পাতা, এরা খায় শুকনো তালের পাতা! একপেট খেয়ে ঘুম পাচ্ছিল। কিচ্‌কিন্দেকে বললুম, 'কিচ্‌কিন্দে শোবার ঘরটা কোথায়? একটু দুপুরবেলা ঘুমোতে হবে। বিকেলে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব।'

'আচ্ছা বাবু'—বলেই কিচ্‌কিন্দে একটা ছাদে খাটিয়া পাতা রয়েছে সেইখানে আমাকে এনে বললে, 'এই খাটিয়াতে একটু গড়াগড়ি দাও, আমি ঠিক সকাল পাঁচটার সময় তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাব।' বলেই কিচ্‌কিন্দে চলে গেল। বিছানায় শুতে গিয়ে দেখি, খানকতক ইট পাতা রয়েছে! তখন বুঝলুম এদের বালিস তোষক নরম নয়; শক্ত ইট; আর ছাদ হচ্ছে এদের ঘর, ঘর হচ্ছে ছাদ! ইটের বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে কিছুতে ঘুম আসে না, তখন মনে দেখি উপুড় হয়ে শুয়ে। যেমন উপুড় হওয়া আর অমনি ঘুম—টিকটিকির মতো ইটের দেয়ালে হাত-পা ছড়িয়ে আরামে ঘুম! এমন ঘুম কখনো হয়নি। যখন বেলা পড়ে এসেছে তখন কিচ্‌কিন্দে এসে বললে, 'বাবু চল একটু রথতলায় বেড়িয়ে আসি।'

'চল'—বলে কিচ্‌কিন্দের সঙ্গে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে রথতলায় চলেছি, এমন সময় দেখি গোবিন্দর মা একটি ভোঁদড়-ছানা নিয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে আর সুর করে ছড়া কাটছে—

'ধেই-ধেই চাঁদের নাচন।
বেলা গেল চাঁদ নাচবি কখন।'

তখন পিসির দেশের কালাচাঁদ নাচতে-নাচতে পুবদিকে অস্ত যাচ্ছেন আর সোনারচাঁদ নাচতে-নাচতে পশ্চিম দিকে উদয় হচ্ছেন। এই দুই চাঁদের আলোয় সমস্ত পৃথিবীটা গোবিন্দর মায়ের ফুলো গালের মতো খানিক আলো খানিক কালো দেখা যাচ্ছে। আকাশ দেখতে হয়েছে যেন হলদে-আর-কালো ডুরেশাড়িখানি। হাওয়া বইছে আধেক গরম আধেক ঠাণ্ডা। আমাকে দেখে গোবিন্দর মা বলছে, 'ও কিচ্‌কিন্দে, এ কাদের ছেলে গো?'

'আমাদের দাদাবাবু গো। মামার বাড়ির লোক। এনাকে একবার রথতলাটা দেখিয়ে আনি।'

'চল, আমিও যাই একবার রথতলায়'—বলেই গোবিন্দর মা ভোঁদড়-ছানাটি কোলে আমাদের সঙ্গে চলল।

সমুদ্দুরের ধারেই রথতলা। বেশ জায়গাটি। চারদিকে ঝাউবন, মাঝে অনেকখানি বালি—পরিষ্কার তকতক করছে। তারই মাঝে মুড়ো রথখানা—তার চাল নেই, চুড়ো নেই। সেইখানে দেখি হারুন্দে হয়েছে সদ্দার আর কাসুন্দে বাসুন্দে ঝালুন্দে মালুন্দে হয়েছে চিতাবাড়ি আর ধাঁইকিড়ি। চিতাবাড়ির দল ধরেছে দুই লাঠি, ধাঁইকিড়ির দল ধরেছে দুই লাঠি। হারুন্দে এক-একবার হাঁক দিচ্ছে—

'ইকড়ি-মিকড়ি চামচিকড়ি
চাম্ কৌটো মজুন্দার
ধেয়ে এসো দামুদার—'

আর অমনি দুই দলে ঠকাঠক লাঠি ঠুকছে। দেখতে-দেখতে দেখি আর মানুষ চেনা যায় না! কোথায় কাসুন্দে কোথায় বাসুন্দে কোথা বা ঝালুন্দে কোথা বা মালুন্দে। কেবল একরাশ কাঁকড়া আর মাকড়সা বালির ওপর ইকড়ি-মিকড়ি কচ্ছে। আর তাদের মাথার ওপরে একরাশ কালো-কালো চামকিচে চামচিকড়ি ডানাগুলো ঝেড়ে-ঝেড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে! লড়াই হতে-হতে যেমন একটা চামচিকে চিক্ করে মাটিতে পড়েছে আর অমনি সব ইকড়ি-মিকড়ি গিয়ে তাকে ধরে ফেলেছে! অমনি হারুন্দে ডাকছে—

‘দামুদার ছুতারের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।’

যেমন এই কথা বলা অমনি সবাই মিলে চামচিকের মতো রোগা-পটকা ছুতোরের পো-কে হিংচে গাছে চুলের দড়ি দিয়ে বেঁধেছে! তখন হিংচে গাছ কচ্ছে কড়মড়! তখন ইকড়ি-মিকড়ি দল হিংচে গাছের চারদিকে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে-গেয়ে ঘুরতে লেগেছে—

‘চাঁদ-চাঁদ-চাঁদ গগনচাঁদ
হিংচে বনে শশী!
ওই এক চাঁদ এই এক চাঁদ—
চাঁদে মেশামেশি।’

‘ও কিচ্‌কিন্দে এ-সব হচ্ছে কি?’

‘একে বলে চিকড়ি-মিকড়ি খেলা’—বলেই কিচ্‌কিন্দে একটা বাঁশি বাজাতে লেগেছে। আর অমনি দেখি ইকড়ি-মিকড়ি হয়ে গেছে চিতাবাড়ির দল আর চামচিকড়ি হয়ে গেছে ধাঁইকিড়ির দল! যেমন কাসুন্দে বাসুন্দে ঝালুন্দে মালুন্দে ছিল সবাই তেমনি হয়ে গেছে! আর নাচতে-নাচতে তারা এসে আমাদের বলছে—

‘ধিনতা নাচন মধুর বচন তোমরা কর কি?’

অমনি গোবিন্দর মা গাল ফুলিয়ে বলছেন—



‘মনের আনন্দে মোরা খোকন নাচাচ্ছি।’

‘গোবিন্দর মা, দেখি তোমার খোকা’—বলেই হারুন্দে ভোঁদড়-ছানাকে নিয়ে যেমন তার পেটে ফুঁ দিয়েছে আর অমনি সে একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা হয়ে উড়ে পালিয়েছে—একেবারে মুড়ো রথের চুড়োয়। সেখান থেকে প্যাঁচাটা আমায় ডাকছে, ‘ঘু-ঘু-ঘু মেতি—সু পেটে—ফুঁ।’

‘ও কিচ্‌কিন্দে প্যাঁচাটা বলে কি?’

‘যাও না, তোমায় খেলতে ডাকছে।’

‘ও কিচ্‌কিন্দে, আমি তো উড়তে পারিনে, তবে ওর কাছে যাই কেমন করে?’

‘উড়বে নাকি?’ বলেই হারুন্দে যেমন আমার পেটে এক ফুঁ দিয়েছে আর আমি হয়ে গেছি একটা হুমো পাখি হুতুম থুমো। গোবিন্দর মা যেমন আমাকে ধরতে এসেছে আর আমি উড়ে গিয়ে একেবারে মুড়ো রথের চালে গিয়ে বসেছি। প্যাঁচাটা আমাকে হঠাৎ দেখেই একটু ভয় খেয়ে গেছে, তারপর যখন দেখছে আমি তারই বড়দাদা হুতুম প্যাঁচা তখন সে আস্তে-আস্তে কানের কাছে এসে বলছে—

একটি কথা।—কি কথা?
ব্যাঙের মাথা।—কি ব্যাঙ?
সরু ব্যাঙ।—কি সরু?

বামুন গরু।—কি বামুন?
ভাট বামুন।—কি ভাট?
গো ভাট।—কি গো?
চিতি গো।—কি চিতি?
সোনা চিতি।—কি সোনা?
গিনি সোনা।—কি গিনি?
মানুষের গিনি।—কি মানুষ?
বনমানুষ।—কি বন?
খেজুরবন।—কি খেজুর?
ঠিক মজুর।—কি ঠিক?
বেঠিক।

'ঠিক-ঠিক।' বলে উড়তে-উড়তে আমরা গিয়ে খেজুর গাছে বসেছি। সেই খেজুর গাছের তলায় কতকালের পোড় একটা আখবাড়ি রয়েছে, তাতে একখানা মরচে-ধরা আখমাড়ার কল, একটা ভুঁড়োশেয়ালি সেই আখমাড়া কলটা ধরে ঘোরাচ্ছে—ক্যাঁচকোঁচ। প্যাঁচা দেখেই বলছে—

আখবাড়ি পাশে
ভুঁড়োশেয়ালি নাচে।

আমি বলছি, 'তারপর?'

'তারপর শুনবে গল্পটা? তবে শোনো'—বলেই প্যাঁচা বলছে—

'এক যে ছিল শেয়াল
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল।'

'বুঝেছ ভাই—সে ভারি কাণ্ড! বুঝেছ কিনা—"শেয়াল তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল!" শেয়াল দেয়াল দিচ্ছে না, দিচ্ছে তার বাপ—বুঝেছ? সে ভারি কাণ্ড। শেয়ালের বাপের নাম কি জানো?—

'তার বাপের নাম রতা।'

'সে রতা শেয়াল, বুঝেছ কিনা—দেয়াল যে দিচ্ছে সে রতা শেয়াল; —শেয়ালের বাপ শেয়াল, বুঝেছ?'

'এক যে শেয়াল
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল ॥
তার বাপের নাম রতা

ফুরোল আমার কথা ॥'

'তারপর?'

'তারপর আর কি?'

'এই বুঝি তোমার গল্প হল? দেখ ভাই প্যাঁচ, একটা যদি বড় গল্প না বল, তবে তোমার সঙ্গে এই আড়ি দিলুম বলে!'

'রোসো-রোসো আড়ি দিও না। মনে পড়েছে একটা মস্ত ব্যাঙের গল্প; বলি শোনো' —বলেই প্যাঁচা আরম্ভ করেছে—'তাঁতি ঘরে ব্যাঙের বাসা! তাঁতঘর দেখেছ তো? সেই যেখানে খট্-খট্ করে তাঁতি-বুড়ো মাকু চালায় আর সর্-সর্ করে কাপড় বার হয়—দশ হাতি, বারো হাতি, চোদ্দ হাতি, খ্যাপা হাতি, পোষা হাতি!'

'না ভাই, তাঁতশালা কখনো দেখিনি, কিন্তু কাপড়ের হাতি আমি অনেক দেখেছি, আসল হাতির মতোই সেগুলো মোটাসোটা!'

'আচ্ছা গোল কোরো না, শোনো ফের বলছি—

'তাঁতি ঘরে ব্যাঙের বাসা, তিনটে পেড়েছে ছানা।
খায় দায় নিদ্রা যায়, তাঁতঘরে তার থানা ॥'

'বুঝেছ?'

'বুঝেছি, তাঁতির ঘরে তিনটে ব্যাঙের ছানা হল। কিন্তু তারপর কি হল তো বুঝতে পাচ্ছিনে!'

'এঃ, তুমি ভারি বোকা! তাঁতির ঘরে ব্যাঙের তিনটে ছানা হল, বাড়ির সবাই যখন খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে গেল, তখন তাঁতি-বুড়ো গিয়ে থানায় খবর দিচ্ছে—দারোগা সাহেব, তিনটে ব্যাঙের ছানা আমার সব সুতো খেলে—সর্বনাশ করলে।

'কি, আমি থাকতে ডাকাতি? রামসিং আমায় এক ছিলিম তামাক দাও আর তাঁতির সঙ্গে গিয়ে বেঁধে আনো সেই ব্যাঙ তিনটেকে!—বলেই দারোগা-সাহেব গুড়গুড়ি টানতে-টানতে খাটিয়াতে শুলেন। যেমন শোয়া আর অমনি ঘুম! এখন তো—"খায় দায় ঘুম যায়, তাঁতঘরে তার থানা"—এটার মানে বুঝলে? তারপর শোনো—

'সুবুদ্ধি তাঁতির ব্যাটা কুবুদ্ধি ধরিল।
তার একটি ছানারে পায়ে চেপে মেল ॥

'সুবুদ্ধি তাঁতি ঠিক কাজ রেছিল—রামসিং এসে তিনটি ছানাকেই পুলিশে নিয়ে জরিমানা করে দিত—কিন্তু সুবুদ্ধির ছেলে কুবুদ্ধি করেছে কি, আস্তে আস্তে একটি ব্যাঙকে ধরেছে, ধরেই পা দিয়ে এক টিপ্‌নি! আর অমনি ফটাস করে ভুঁইপটকার মতো ফেটে গেছে ব্যাঙের পেট, যেমন ফটাস করে শব্দ হওয়া অমনি দুটো ব্যাঙ পগার পার—একটা গিয়ে মাঠের ধারে গাছে চড়েছে, আর একটা করেছে কি, বলি তবে শোনো—

'আর একটি ব্যাঙ ছিল বড়ই সিয়ানা।

লিখন পাঠায়ে দিল পরগনা-পরগনা ॥
আজিপুর গাজিপুর মধুপুর ডাঙা।
লক্ষ ব্যাঙ এল তথা চক্ষু করে রাঙা ॥

'এসেই কুবুদ্ধির মুখে লাথি! লক্ষ ব্যাঙের রাঙা চোখ দেখেই তাঁতির পোর প্রাণ উড়ে গিয়েছিল, তার ওপর ব্যাঙের লাথি খেয়ে সে তত আধ-মরা হয়ে থাক। এদিকে সুবদ্ধি আর রামসিং দোবে আসছেন রাজহাটের মাঠ দিয়ে—এমন সময় হল কি? না—

'সুতোনাতা নিয়ে তাঁতি যাচ্ছে রাজার হাট।
লক্ষ ব্যাঙের তাড়াতাড়ি আগুলিল ঘাট ॥

'যেমন ব্যাঙগুলোকে দেখা অমনি রামসিং তালপাতার-সেপাই—বাপরে! বলে, মেরেছে এক দৌড়। তাঁতি তখন আর করেন কি, না—

'তরাসে মরাসে তাঁতি গাছেতে উঠিল।

'একটা ছিল মুড়ো খেজুর গাছ, যেমন তাড়তাড়ি ওঠা আর অমনি—

'কোথা ছিল কোলাব্যাঙ মুখে লাথি মেল ॥

'লাথির ওপর লাথি! কোলাব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি তো মরো-মরো; ধপাস করে পড়েছে খেজুরতলায় আর অমনি সব ব্যাঙ তাকে এসে ধরেছে! তখন সেই সিয়ানা ব্যাঙ বলছে—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

'মেরো না ধর নাল ভাই তাঁতিরে গোঁসাই।

'এখনি দারোগা এসে হাতে হাতকড়ি দেবে। পায়ে বেড়ি পড়লে তখন পালানো দায়। সরে পড় এইবেলা!—বলতেই যত ব্যাঙ আজিপুরে গাজিপুরে চম্পট! এদিকে তো—

'মেরো না ধর না, ভাই তাঁতিরে গোঁসাই।

'ওদিকে রামসিং এসে তার হাতে দিয়েছে হাতকড়ি।'

'কেন, তাঁতির হাতে দড়ি পড়ল কেন?'

'তার ছেলে কুবদ্ধি ব্যাঙ মেরেছে বলে।'

'কুবুদ্ধির কি হল?'

'কুবুদ্ধির পায়ে বেড়ি পড়ল। আর কি হবে?'

'পরে সেই রামসিং দোবের কিছু হল না?'

'হল বৈকি। ব্যাঙের দিষ্টিতে তার মুখ পুড়ে গেল, মুখে আর তার কিছু রোচে না—

'নিম লাগে মিষ্টি!
সন্দেশ লাগে তেতো!
মুড়কি বলে ঝাল!

'সে কেবল ঘুষ খেয়ে-খেয়ে ছিষ্টি ব্যাঙেরা গালাগালি খেয়ে-খেয়ে বেড়াতে লাগল।'

'আর সেই দারোগা কি করলে?'

'সে আর করবে কি? ব্যাঙের তার গায়ে যত ধুলো দিলে সে তা ফুঁয়ে উড়িয়ে মনের আনন্দে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে লাগল।'

বলেই যেমন প্যাঁচা ফুঁ দিয়েছে আর অমনি সেই ফুঁ এসে আমার গায়ে লেগেছে। যেমন গায়ে লাগা আর আমি মানুষ হয়ে যাওয়া, যেমন মানুষ হওয়া আর ধুপুস করে ভাদ্দর মাসের তালের মতো মাটিতে পড়া আর ভুঁড়োশেয়ালি খপ্ করে আমাকে তুলে দে-ছুট! এক ছুটে শেয়ালটা আমাকে তালতলাতে এনে হাজির করেছে। সেখানে একজোড়া ছেঁড়া তালতলার চটি পড়েছিল, সেইটে মুখে করে এনে শেয়াল আমাকে বলছে, 'খাবে?'

আমি বলছি, 'দূর! আমি কেন জুতো খেতে গেলুম! তুই খা!'

অমনি শেয়ালটা কসকস করে চটি জুতোটা গিলে ফেলেছে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলছে—

'বাপ ভনরি!
কি খাইতে সাধ করেছ? —চালদা মসুরি?'

আমি শেয়ালকে বলছি, 'দেখ শেয়াল, আমার নাম ভনরি নয় আর আমি তোমার বাপও নয়। আমাকে ভুল করে এখানে এনেছ। আমি চালদা পেলে খাই কিন্তু মসুরি খাটিয়ে তার ভেতর আমরা ঘুমোই, মসুরি আমি কিছুতে খাব না!'

শেয়ালটা বোধহয় আমার কথা বুঝলে না, সে আবার বললে—

'বাপ নন্দলাল!
কি খাইতে সাধ করেছ? —পাকা তাল?'

'ওরে বাপু, আমি নন্দলালও নই, ভনরিও নই, তোর বাপও নই! তোর বাপের নাম হল রতা আর আমার নাম হল আবু। দুটো তাল পেড়ে দাও তো খাই, নয়তো বল ঘরে যাই। তালের বড়া কিম্বা তালফুলুরি, না হয় গাছপাকা তাল, এই তিনটের একটা যদি দিতে পার তো থাকি, নয়তো আমাকে বাপু পিসির বাড়ি রেখে এসো।'

'এই তো তুমি অন্যায় কইলে। তাল তোমাকে দিই কেমন করে? তালগাছে কে থাকে জানো? বলেই শেয়ালটা বলছে—

'এক যে আছে একা-নোড়ে,
সে থাকে তালগাছে চড়ে।
দাঁত দুটো তার মুলোর মতো,
পিঠখানা তার কুলোর মতো!
কান দুটো তার নোটা-নোটা,
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা!
        কোমরে বিচুলি দড়ি
বেড়ায় লোকের বাড়ি-বাড়ি।
        তাল খেতে যে কাঁদে—
তাকে ঝুলির ভেতর বাঁধে।
        গাছের ওপর চড়ে
আর তুলে আছাড় মারে।'

'ওইরে একা-নোড়ে!' —বলে শেয়ালটা যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছে অমনি আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছি, আর অমনি কি একটা তালগাছে উড়ে এসে বসেছে আর মাথা নেড়ে-নেড়ে বলছে—

'কান-কাটা বলে আমি
        এই গাছেতে আছি।
যে ছেলেটা কাঁদে তার
        কানে ধরে নাচি ॥'

আমার তখন আরো ভয় হয়েছে, আমি দুই হাতে কান চেপে ধরে ফোঁস-ফোঁস করে ফুঁপিয়ে একেবারে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছি। অমনি শেয়াল বলে উঠেছে, 'কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া!' আর সেখানে যত শেয়াল ছিল সব ছুটে এসে ডাকতে লেগেছে, 'ক্যাহুয়া-ক্যাহুয়া-ক্যাহুয়ারে-ক্যাহুয়া?'

বুড়ি খ্যাঁকশেয়ালি ছিল গর্তের ভেতর, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলছে, 'তোরা কি গোল লাগিয়েচিস! ভালো করে দেখ দিকিন কে?'

যত ভুঁড়োশেয়াল আমার মুখের কাছে এসে আলোয়া ধরে-ধরে দেখছে আর খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হেসে পালাচ্ছে। এমন সময় অন্ধকার থেকে হাতি আমার পিঠে শুঁড় বুলিয়ে বলছে—

‘ওরে-বাপ নয় রে মানুষ
উড়ে পড়ল ফাঁনুশ!’

মানুষের নাম শুনেই শেয়ালদের ভয় হয়েছে। তখন তারা সব ল্যাজ গুটিয়ে হাতজোড় করে বলছে—

‘বাপধন রাজার নাতি
চড়ে কে গো মস্ত হাতি!’

যেমন শেয়ালরা এই কথা বলা আর অমনি হাতি শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে আমাকে পিঠে উঠিয়েছে! হাতিতে চড়ে আমার ভারি আহ্লাদ হয়েছে, আমি হাততালি দিয়ে বলছি—

‘তাই-তাই-তাই মামার বাড়ি যাই।’

অমনি হাতি বলছে, ‘তোমার মামার বাড়ি কোথায় বল তো?’

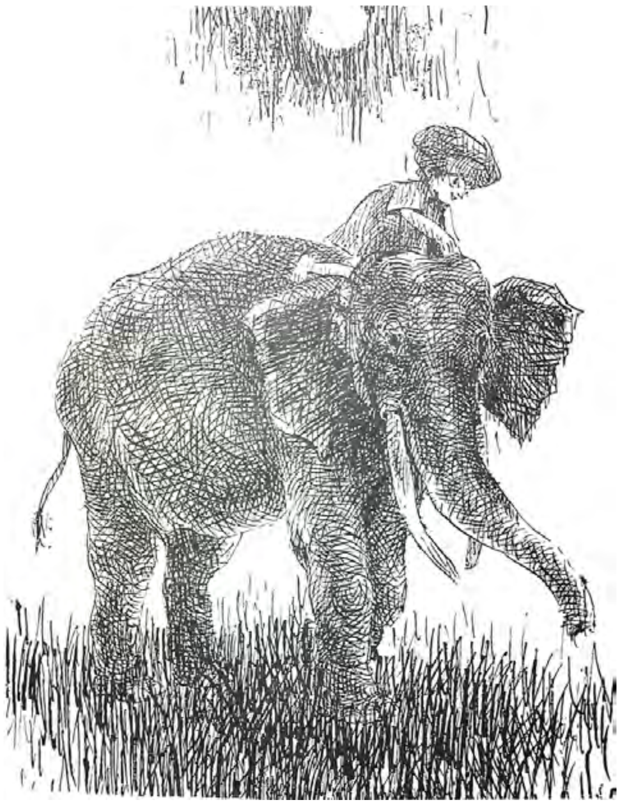
‘আমার মামাবাড়ি যশোর দক্ষিণডিহি চেঙুঠে পরগনা।’

‘আচ্ছা চল সেখানেই যাচ্ছি’—বলেই হাতি চলতে আরম্ভ করলে—হুস-হাস থপাস-থপাস! দেখতে-দেখতে মামাদের কলাবাগানে এসে পড়েছি। সেখানে দেখি হনুমান হুপ-হাপ করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। যেমন আমি বলেছি—

‘ও হনুমান, কলা খাবি?
জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি?’

অমনি হনুমান দাঁত-খামাটি দিয়ে মুখ ভেংচে বলছে, ‘রাম রাম! রোস তো আদুরে ছেলে! তোর মামার বাড়ি যাওয়া বার করছি!’ বলেই হনুমান একটি কলা নিয়ে যেমন ডেকেছে—

‘আদুরের কলাগুলি বাদুড়ে খায়,
ধর-ধর খোকামণি মামার বাড়ি যায়।’



আর অমনি দুটো বাদুড় এসে ছোঁ মেরে হাতির পিঠ থেকে আমাকে তুলে নিয়ে দৌড়—একেবারে পিসির তেঁতুলতলায়! সেখানে আমাকে এনে ফেলেই বাদুড় দুটো হয়ে গেছে হারুন্দে আর কিচ্‌কিন্দে! তাদের দেখে আমার ভারি রাগ হয়েছে, কেমন মামার বাড়ি যাচ্ছিলুম, কেবল যেতে দিলে না আমাকে এই দুটো বাদুড়! যেমন এই কথা মনে করেছি আর অমনি কিচ্‌কিন্দে বলছে, 'মামার বাড়ি যাচ্ছিলে তো যাচ্ছিলে, কলাবাগানে হনুমানজিকে বলতে গিয়েছিলে কেন—

'ও হনুমান, কলা খাবি?
জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি?

'জয় সীতারাম দেখতে যাবি—বলতে পারনি? হনুমান রেগে তোমার ইস্কুলের ছুটি কেটে দিয়েছে, এখন আর তুমি পিসির বাড়ি থাকতে পারবে না, এখন তোমায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়তে হবে আর জোড়া-বেত খেতে হবে। চল'-বলেই আমাকে পালকিতে ভরে হারুন্দে আর কিচ্‌কিন্দে পাঠশালায় নিয়ে চলল।

'ওরে আমাকে তোরা ছেড়ে দে, আমি এমন কাজ আর কখনো করব না। ও কিচ্‌কিন্দে, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে গুরুমশায়ের কাছে দিস্‌নে, আমি পড়ব না, আমি ছবি লিখব, আমি যাব না পাঠশাললে যাব না—আ—আ' বলে পালকির ভেতর আমি হাত-পা আছড়ে কাঁদতে লেগেছি। জোড়া-বেতের নাম শুনে ভারি ভয় হয়েছে। হারুন্দে কিচ্‌কিন্দে পালকির দুই দরজা চেপে ধরে আমাকে গুরুর পাঠশালে হাজির করে বলছে—

'গুরু-মশাই গুরু-মশাই
তোমার পোড়ো হাজির।
চড়চড়িয়ে পড়ুক বেত
হোক বিচার কাজির ॥'

শুনছি গুরুমশায় ঘরের ভেতর থেকে মন্তর পড়ছেন—

'আয় ধুগ্‌ড়ি
ধুগ্‌ড়ি মন্তর গায়।
চড়চড়িয়ে পড়ু ক বেত
পড়পড়িয়ে যায়।।'

যেমন এই মন্তর পড়া আর দেখি জোড়া-বেত নাচতে নাচতে গুরুমশায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে মাছরাঙা গুরু নাকের ওপরে চশমা লাগিয়ে এসে বলছেন, 'পড়—



'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে।

মৎস ধরিবে খাইবে সুখে।।'

আমার তখন ভয়ে কি পড়া আসে! আমি বলে ফেলেছি—

'লিখিবে পড়িবে থাকিবে সুখে।
মৎস্য ধরিবে মরিবে দুখে ॥'

অমনি গুরু এক বেতের খোঁচা দিয়ে বলছেন, 'ভুল হল! লেখাপড়া করলে কি হয়? সুখে থাকে? না দুঃখে থাকে?'

আমার তখন মনে পড়েছে পিসির বাড়িতে সব উল্টো। আমি অমনি ফস করে বলেছি, 'দুঃখে থাকে মশাই, দুঃখে থাকে।'

'ভালো রে ভালো! আচ্ছা তোর নাম তো অবু? লেখ দেখি—

'অবু তবু গিরি সুতা।
মায়ে বলে পড় পুতা ॥
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
না পড়লে ঠ্যাঙার গুঁতি ॥'

আমি জানি সব উল্টো লিখতে হবে, না হলে বেত, কাজেই আমি মাটিতে খড়ি দিয়ে একটা চৌকো ঘর কেটে লিখছি—প্যাঁচা-পেঁচি দুই ভূতা। কিন্তু যেমন লিখছি—মায়ে বলে পড় পুতা—অমনি আমার মাকে মনে পড়ে গেছে, আমি খড়ি ফেলে দিয়ে একেবারে পাঠশালা থেকে দৌড়! এক-দৌড়ে ষষ্ঠীতলায় হাজির। সেখান থেকে দেখছি—গঙ্গার ওপারে তুলসীগাছের পাতা ঝুর-ঝুর করছে, তারই তলায় মা-আমার দুগ্গো-পিদিম জ্বালছেন! ওদিকে দেখছি গুরুমশায় ঠ্যাঙার গুঁতি হাতে, সঙ্গে হারুন্দে, কিচ্‌কিন্দে আর সেই মনসা-বুড়ো আর আংলা-বাংলা যত ভূত-পেরেত! যেমন গুরুকে দেখা আর 'মা!' বলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি, আর আমবাগানে আমার ছোট-ছোট দাদা-দিদিরা আম-কুড়োতে লেগেছে। আমিও মায়ের বাড়িতে আঁচল ভরে শিল আর আম কুড়োতে লেগে গেছি। ভূত-পেরেত কেউ সেখানে আসবার জো নেই। এসেছে কেবল আমার সঙ্গে উড়তে-উড়তে গোবিন্দর মায়ের ভোঁদড়-ছেলে, আর আমার বন্ধু সেই লক্ষ্মীপ্যাঁচাটি। তাকে একটা আমগাছের কোটরে বাসা বেঁধে দিয়েছি, রোজ রাত্তিরে সে আমার গায়ে ফুঁ দেয় আর আমি মাসির বাড়ি, পিসির বাড়ি উড়ে বেড়াই। আমার ভূতপত্‌রী লাঠিটি কিন্তু গোবিন্দর মা চুরি করে রেখে দিয়েছে। লাঠি নইলে তো চলতে পারি না। তোমরা সবাই চাঁদা করে যদি আমাকে একটা আঁকাবাঁকা লাঠি কেনবার পয়সা দাও তবে সেইটে নিয়ে আমি একবার মামার বাড়ি যাই, আর তোমাদের জন্যে বাঁকানদীর ধার থেকে অনেক আঁকাবাঁকা ছবি যোগাড় করে আনতে পারি।



ভূত পত্‌রীর দেশ • অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ই-বুকটি সমাপ্ত হল ॥